খোয়াই নদীর পাড়ে

বার্ষিকী-২০২২ইং

Habiganj Polytechnic Institute

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, হবিগঞ্জ।

কারিগরি শিক্ষা নিলে
বিশ্ব জুড়ে কর্ম মিলে।

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

হবিগঞ্জ-৩৩০০
HPI(T&T): 083162320
web: www.hpi.gov.bd
email: principal.hpi@gmail.com

Habiganj Polytechnic Institute

ধরণ	ঃ সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
স্থাপিত	ঃ ২০০৫
অধ্যক্ষ	ঃ প্রকৌশলী মোঃ আলাউদ্দিন
অবস্থান	ঃ হবিগঞ্জ, বাংলাদেশ ২৪.৩৩১৪১৮° উত্তর ৯১.৪৪২৮১৯° পূর্ব
শিক্ষাঙ্গন	ঃ শহুরে ২ একর (০.৮১ হেক্টর)
অধিভুক্তি	ঃ বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড
ওয়েবসাইট	ঃ hpi.gov.bd

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের একটি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটটি ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি ২ (দই) একর জমির উপর দক্ষিণমুখী।

অবস্থান ঃ

ধুলিয়াখাল হতে মিরপুর, শ্রীমঙ্গল রাস্তার উত্তর-পার্শ্বে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ৫নং গোপায়া ইউনিয়নের নূরপুর (উত্তর) মৌজার অন্তর্গত। প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব হবিগঞ্জ জেলা শহর হতে প্রায় ৫কিঃমিঃ এবং শায়েস্তাগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন হতে প্রায় ১০ কিঃমিঃ)

ইতিহাস ঃ

প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় ২৭ অক্টোবর ২০০২ সালে (১২ই কার্তিক ১৪০৯বঙ্গাব্দ) এবং একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫সালে।

ক্যাম্পাস ঃ

প্রযুক্তি ঃ

১. সিভিল
২. স্থাপত্য ও অভ্যন্তরীন নকশা
৩. কম্পিউটার
৪. ইলেক্টনিক্স
৫. ননটেক বিভাগ

ছাত্রাবাস ঃ

ইনস্টিটিউটে সরকারি ছাত্রাবাস না থাকলেও ইনস্টিটিউটের আশেপাশে অনেক ব্যক্তি মালিকাধীন ছাত্রাবাস রয়েছে। যেখানে দেশের অন্যান্য জেলা হতে আগত শিক্ষার্থীরা অবস্থান করে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

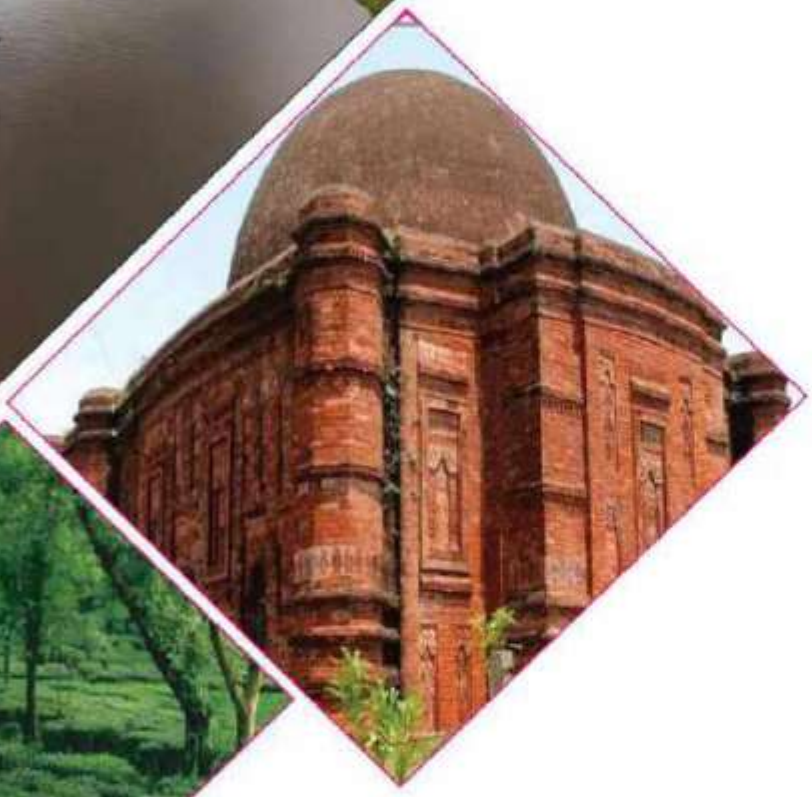

এক নজরে হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ হলো বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল।সুফি সাধক হযরত শাহ্ জালাল (রাঃ) এর অনুসারী সৈয়দ নাছির উদ্দিন (রাঃ) এর পূন্যস্মৃতি বিজরিত খোয়াই, করাঙ্গী,সুতাং,ি-বজনা,রত্না প্রভৃতি নদী-বিধৌত হবিগঞ্জ একটি ঐতিহাসিক জনপদের নাম। ঐতিহাি-সক সুলতানসী হাবেলীর প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ সুলতানের অধঃস্তন পুরুষ সৈয়দ হেদায়েত উল্লাহ্র পুত্র সৈয়দ হবিব উল্লাহ্ খোয়াই নদীর তীরে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন।তার নামানুসারে হবিব গঞ্জ থেকে কালক্রমে হবিগঞ্জে পরিণত হয়।ইংরেজ শাসনামলে ১৮৬৭ সালে হবিগঞ্জকে মহুকুমা ঘোষণা করা হয় এবং ১৮৬৮ সালে হবিগঞ্জ মহুকুমা গঠন করা হয় এবং সর্বশেষ ১৯৮৪ সালের পহেলা মার্চ(বাংলা ১৭ই ফাল্গুন)তা জেলায় উন্নীত হয়।

দর্শনীয় স্থান সমূহঃ

১) তেলিয়াপাড়া চা বাগান সংলগ্ন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ,মাধবপুর
২) দ্য প্যালেস লাক্সারি রিসোর্ট,পুটিজুরি
৩) সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান
৪) রেমা-কালেঙ্গা বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য
৫) শাহ্জিবাজার বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও রাবার বাগান
৬) লক্ষ্ণী বাউর ,সাগর দিঘী ও রাজবাড়ী,বানিয়াচং
৭) বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র,নবীগঞ্জ
৮) হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড ও ফ্লুট ভ্যেলি,মাধবপুর
৯) হবিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক,অলিপুর
১০) রূপাইছড়া রাবার বাগান,বাহুবল
১১) হরিণ পার্ক, শাহ্জিবাজার হিলটপ

প্রকাশনা পর্ষদ ঃ

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রধান পৃষ্টপোষক ঃ জনাব প্রকৌশলী মোঃ আলাউদ্দিন, অধ্যক্ষ(অতিরিক্ত দায়িত্ব) ।

উপদেষ্টামন্ডলী ঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী
১.	জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন	ইন্সট্রাক্টর (টেক)সিভিলও বিভাগীয় প্রধান,এআইডিটি
২.	জনাব সেলিমা খাতুন	ইন্সট্রাক্টর (টেক)সিভিলও বিভাগীয় প্রধান,সিভিল
৩.	জনাব শাকিল আহম্মদ চৌধুরী	ইন্সট্রাক্টর (টেক)ইলেকট্রনিক্স ও বিভাগীয় প্রধান,কম্পিউটার
৪.	জনাব ফখরুল ইসলাম চৌধুরী	ইন্সট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স ও বিভাগীয় প্রধান
৫.	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম	ইন্সট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স ও বিভাগীয় প্রধান

সম্পাদনা পর্ষদ ঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী
১.	জনাব মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ	ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক)গণিত ও বিভাগীয় প্রধান(নন-টেক)
২.	জনাব মোঃ সোহেল মিয়া	ইন্সট্রাক্টর (টেক) কম্পিউটার
৩.	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন	জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক)সিভিল
৪.	জনাব মোঃ সেলিম ভূইয়্যা	জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক)হিসাববিজ্ঞান
৫.	জনাব মাহফুজা খাতুন	জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর(টেক) এআইডিটি
৬.	জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের	প্রধান সহকারী
৭.	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান	ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক)ইংরেজি

প্রচ্ছদ ও অলংকরন ঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী
১.	জনাব জান্নাতুন্ নাহার দীপ্তি	জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর(টেক) এআইডিটি
২.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল	কেয়ারটেকার
৩.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান	স্টোরকিপার
৪.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টিআর)কম্পিউটার
৫.	জনাব মোঃ আব্দুল গফুর	জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর(টেক) এআইডিটি

প্রচ্ছদ ডিজাইন	আবু নাসের মোহাম্মদ তৌকির	ছাত্র,এআইডিটি,৭ম পর্ব,হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০২২ইং

গ্রাফিক্স ও মুদ্রণে :
রাজেশ সরকার
সুন্দরম কম্পিউটার্স এন্ড অফসেট প্রেস
কালীবাড়ি ক্রস রোড, হবিগঞ্জ।
মোবা: ০১৭১২-৩৩১৯৬৭

অ্যাডভোকেট মোঃ আবু জাহির
সংসদ সদস্য
২৪১, হবিগঞ্জ-৩
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশকে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে কারিগরি শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। জনবহুল এই বাংলাদেশকে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে কারিগরি শিক্ষার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।জনগণের জীবনমান উন্নয়নের সাথে কারিগরি শিক্ষার অগ্রযাত্রা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর কারিগরি শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে কারিগরি শিক্ষা ২% থেকে ১৭% এ উন্নীত হয়েছে। বর্তমান সরকার কারিগরি শিক্ষাকে ২০৩০ সালে ৩০% এ এবং ২০৪০ সালে ৪০% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

আমাদের দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে তা জনসম্পদে পরিণত হবে।তথ্যপ্রযুক্তির বর্তমান বিশ্বে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।প্রযুক্তির কারিগর তৈরির বিদ্যাপীঠ হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ম্যাগাজিন "খোয়াই নদীর পাড়ে" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত ও পুলকিত।

সাহিত্য মানুষের মনের মুক্তির পথ।সাহিত্যই আলোকিত মানুষ,তথা আলোকিত সমাজ ও জাতি গড়তে পারে।ছাত্র-ছাত্রীদের প্রযুক্তির জ্ঞানচর্চায় ব্যস্ত জীবনের মধ্যে সাহিত্যরসের ভান্ডার নিয়ে ম্যাগাজিন "খোয়াই নদীর পাড়ে" প্রকাশ একটি মহতী উদ্যোগ।আমি এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের মঙ্গল কামনা করছি।

(অ্যাডভোকেট মোঃ আবু জাহির,এম পি)

ডঃ ওমর ফারুক
মহাপরিচালক
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
আগারগাঁও,শেরেবাংলানগর
ঢাকা-১২০৭

শুভেচ্ছা বাণী

বর্তমান বিশ্বে যে সকল দেশ কারিগরি শিক্ষার ও এর প্রয়োগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে তারাই আজ বিশ্ব প্রতিযোগিতায় নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত।তাইতো পরিবর্তণশীল বিশ্ব প্রতিযোগিতায় যথাযথ মর্যাদায় মাথা উঁচু করে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন যুগোপযোগী কারিগরি শিক্ষার প্রচার ,প্রসার ও উন্নয়ন।এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে।বিশেষভাবে লক্ষণীয়,২০০৯ সাল পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট ছিল মাত্র ১% ।সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বর্তমানে তা বেড়ে ১৭% এ উন্নীত হয়েছে।২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)অর্জণকে সামনে রেখে সরকার ইতোমধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার ৩০% এ উন্নীত করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সার্বিক গুণগত মান উন্নয়ন সহ এনরোলমেন্ট বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ,প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।ইতোমধ্যে ,ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে এনরোলমেন্ট বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ২৩টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন,চারটি বিভাগীয় শহরে একটি করে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, ২টি নতুন সার্ভে ইনস্টিটিউট স্থাপন,৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ ২টি নতুন সার্ভে ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।এছাড়াও দেশের ৬৪টি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সার্টিফিকেট লেভেলে শিক্ষার্থী এনরোলমেন্ট বৃদ্ধির জন্য ৬৪টি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজেরসক্ষমতা বৃদ্ধিসহ দেশের প্রত্যেক উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন এবং বিএসসি-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে এনরোলমেন্ট বৃদ্ধির জন্য ৪টি বিভাগে ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বৈশ্বিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও একুশ শতক ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে জনপুঁজি হিসেবে গড়ে তুলতে এ সকল কার্যক্রম সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে জাতির পিতা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার সফল বাস্তবায়নে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার এ সফল সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ ২০৪১ সালে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ম্যাগাজিন'২০২২- "খোয়াই নদীর পাড়ে" প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে আজকের নবীন শিক্ষার্থীরা মেধা,মনন ও সৃজনশীলতায় হয়ে উঠবে আরো পরিশীলিত ও দীপ্তিময়।এ ইনস্টিটিউট থেকে সনদপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা আগামী দিনে সুখী,সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিজেদের আত্মনিয়োগ করবে বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

(ডঃ ওমর ফারুক)

মোঃ আলী আকবর খান
চেয়ারম্যান
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও,শেরেবাংলানগর
ঢাকা-১২০৭

শুভেচ্ছা বাণী

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হবিগঞ্জ জেলার স্বনামধন্য বিদ্যাপীঠ হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর বার্ষিক প্রকাশনা "খোয়াই নদীর পাড়ে" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনার দেশ,বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার যুগে সুদক্ষ,বলিষ্ঠ ও প্রতিশ্রুতিশীল প্রকৌশলী গড়ে তুলে দেশের প্রযুক্তির মানোন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার উন্মেষের মাধ্যমে সৃজনশীলতা বিকাশে এই "খোয়াই নদীর পাড়ে" গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

তথ্যপ্রযুক্তির এ দেশ গড়ার কারিগরদের প্রতিভা,জ্ঞান ও মনোজগতকে আলোকোদ্ভাসিত করার ক্ষেত্রে এই ম্যাগাজিন পথপ্রদর্শক।এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল কর্মকান্ডে যুক্ত থেকে অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে এসে সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আলোকিত মানুষ হয়ে উঠবে-এই আমার প্রত্যাশা।

আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি "খোয়াই নদীর পাড়ে" এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং শুভকামনা রইলো সকল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি।

(মোঃ আলী আকবর খান)

ইশরাত জাহান
জেলা প্রশাসক
হবিগঞ্জ

শুভেচ্ছা বাণী

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট একটি স্বনামধন্য ও ঐতিহ্যবাহী কারিগরি বিদ্যাপীঠ।এখান থেকে প্রতিবছর অনেক

ছাত্র-ছাত্রীকারিগরি শিক্ষা নিয়ে দেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে। প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে এ প্রতিষ্ঠানটি।

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে "খোয়াই নদীর পাড়ে" নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। আমি জানি, এখানে শুধু কারিগরি শিক্ষাই দেওয়া হয় না বরং ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজের ও চারপাশের জগতটাকে জানার নানামুখী সাহিত্যচর্চার আয়োজন করা হয়।আশা করছি, এ প্রকাশনা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ প্রশস্ত করবে।

বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ। এ সবই সম্ভব হয়েছে কারিগরি শিক্ষা,প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও সঠিক পরিকল্পনার ফলে।সঠিক সময়ে সঠিক নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বিশ্বে এখন ঈর্ষণীয় উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে, যা অনেক দেশের কাছে মডেল হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে।হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সরকারের উন্নয়নের পথ যাত্রাকে তরুণ ও দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার তৈরীর মাধ্যমে আরো বেগবান করবে,তা আমি মনে করি।

আমি হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(ইশরাত জাহান)

এস এম মুরাদ আলি
পুলিশ সুপার
হবিগঞ্জ

শুভেচ্ছা বাণী

প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের এ যুগেআধুনিক প্রযুক্তির পরশে পৃথিবীতে এসেছে বিস্ময়-কর চমক। প্রযুক্তিতে শিক্ষার প্রসার ও এর প্রয়োগে আজ অনেক দেশ ও জাতি উন্নত থেকে উন্নততর দেশ ও জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে এবং তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছে বিশ্বে। আমাদের দেশও সেদিক থেকে পিছিয়ে নেই। সামনে পথ অনেক, দ্রুত অগ্রসর হতে হবে আমাদের,প্রযুক্তিকে অবলম্বন করে আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশকে আরো গতিশীল ও স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য এবং একটি উন্নত জাতি গঠনে দক্ষ জনবল তৈরিতে কারিগরি শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। এ কথা আজ সবাইকে মনে রাখতে হবে যে,"দক্ষতা যার, নেতৃত্ব তার"। কারিগরি শিক্ষার মতো বাস্তবমুখী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত রাখার জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না।

তাই হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে লুকায়িত সাহিত্যের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য

হবিগঞ্জপলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এ বছর একটি ম্যাগাজিন "খোয়াই নদীর পাড়ে" প্রকাশ করছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত এবং সে সাথে ইনস্টিটিউটের সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি ও সকলের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(এস এম মুরাদ আলি)

প্রকৌশলী মোঃ আলাউদ্দিন
অধ্যক্ষ
হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ও
সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ম্যাগাজিন' ২০২২ প্রকাশনা পর্ষদ

Habiganj Polytechnic Institute

শুভেচ্ছা বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে প্রতি বছর অনেক ছাত্র-ছাত্রী কারিগরি শিক্ষা নিয়ে দেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। এখানে শুধু কারিগরি শিক্ষাই দেওয়া হয় না বরং ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজের ও চারপাশের জগতটাকে জানার নানামুখী সাহিত্য চর্চার আয়োজন করা হয়। মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় এ বছর হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট "খোয়াই নদীর পাড়ে" নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে যাচ্ছে । আশা করি এ প্রকাশনা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ প্রশস্ত করবে।

প্রকাশনা এবং সম্পাদনা একটি জটিল ও চিন্তা জগতের কাজ। অত্যন্ত কর্মব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও প্রকাশনা ও সম্পাদনা পর্ষদের সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি ছিলনা। ভুলত্রুটি সংশোধনের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল। যদি কোন অনিচ্ছাকৃত ও মুদ্রণ জনিত ত্রুটি থাকে, পাঠকগণকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

পরিশেষে, আমি হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা- কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ও সকলের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

২৭/৭/২০২২

(প্রকৌশলী মোঃ আলাউদ্দিন)

মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ
ইনস্ট্রাক্টর(গণিত)
ও
বিভাগীয় প্রধান
(নন-টেকনিক্যাল বিভাগ)
ও
আহবায়ক,সম্পাদনা পর্ষদ
ম্যাগাজিন'২০২২ প্রকাশনা পর্ষদ

Habiganj Polytechnic Institute

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মহান সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সুযোগ্য অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মোঃ আলাউদ্দিন স্যারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে, অত্র ইনস্টিটিউটের সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সার্বিক সহযোগিতায় ও অত্র ইনস্টিটিউটের সকল ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন'২০২২-"খোয়াই নদীর পাড়ে" প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত উচ্ছসিত ও আনন্দিত অনুভব করছি।

খোয়াই নদীটি বাংলাদেশ ও ভারতের একটি আন্তঃসীমান্ত নদী যা হবিগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। হবিগঞ্জ শহর ও হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেছে এ স্রোতস্বিনী। আর ম্যাগাজিন হল সাহিত্য বিষয়ক একটি বই যা মনের পরিধিকে বিকশিত করে। তাই এ নদীর নামেই ম্যাগাজিনটির নামকরণ করা হয়েছে যা পাঠক-হৃদয়ে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে বিশ্বাস করি।এ ম্যাগাজিনের জন্য কারিগরি শিক্ষা নিয়ে দেশ গড়ার প্রত্যয়ে নিয়োজিত ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও তথ্যবহুল,গঠনমূলক এবং বিনোদনমূলক অনেক লিখা জমা দিয়েছে। ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লিখা ও তথ্যাদি একান্তই লেখকের নিজস্ব। সেখান থেকে বাছাই-কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত লিখাগুলো ম্যাগাজিনে স্থান পেয়েছে। তারপরও যদি কোন অনিচ্ছাকৃত ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি থাকে,পাঠকগণকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

ম্যাগাজিনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। এ ম্যাগাজিন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের মনন ও মেধা বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পরিশেষে,সবার সার্বিক মঙ্গল ও সুস্থতা কামনা করছি।

(মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ্)

সিভিল টেকনোলজির শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ

সেলিমা খাতুন
ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান

মোঃ সালাহ উদ্দিন
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর

ইকরামুল মজিদ
অতিথি শিক্ষক

তায়েবা আক্তার
অতিথি শিক্ষক

মহিবুর রহমান
অতিথি শিক্ষক

এফ এম আল আমিন
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

নুসরাত জাহান
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

আল ফয়েজ
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

তরিকুল ইসলাম
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

অলক রায়
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

জ্যোৎস্না হামিদ
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

শুক্লা পাল
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

মহিউল ইসলাম হৃদয়
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

মোঃ রহিম উদ্দিন
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী

ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ

ফখরুল ইসলাম চৌধুরী
ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান

মোঃ রবিউল ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর

মাহমুদা নাজনীন সুমি
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর

মোঃ মকছুদ আলম
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর

মোঃ নাজমুল হাসান
অতিথি শিক্ষক

শফিকুর রহমান
অতিথি শিক্ষক

মোঃ আবুল খায়ের
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

ইন্দু মাধব তালুকদার
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

রনি চন্দ্র দাস
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

নাজমা খাতুন
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

পারভেজ পাঠান
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

মওদুদ আহমেদ রানা
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

সৈয়দ রাশেদুজ্জামান
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

নাজমুল ইসলাম
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী

কম্পিউটার টেকনোলজির শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ

শাকিল আহমদ চৌধুরী
ইন্সট্রাক্টর (ইলেক্ট্রনিক্স)
ও বিভাগীয় প্রধান

মোঃ সোহেল মিয়া
ইন্সট্রাক্টর

পারুল রানী দাস
ইন্সট্রাক্টর

জুয়েল দাস আশীষ
ইন্সট্রাক্টর

মোছাঃ আছিয়া খাতুন
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর

আকলিমা আক্তার লিমা
অতিথি শিক্ষক

নওরীন ফাইরোজ শশী
অতিথি শিক্ষক

মোঃ জিয়াউর রহমান
অতিথি শিক্ষক

মামুনুর রশীদ
অতিথি শিক্ষক

সঞ্চিতা রাণী পাল
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

নাসির উদ্দিন
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

মিজানুর রহমান অপু
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

সজিব মন্ডল
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

লক্ষ্মী রাণী দেব
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

মোঃ নজরুল ইসলাম
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

মোঃ মাসুদুর রহমান
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী

আর্কিটেকচার ইন্টেরিয়র ডিজাইনার শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ

মোহাম্মদ কামাল হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (সিভিল)
ও বিভাগীয় প্রধান

জান্নাতুন নাহার দীপ্তি
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর

মোঃ আব্দুল গফুর
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর

মোসাঃ মাহফুজা খাতুন
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর

শাহিনুর আক্তার ইয়াসমিন
অতিথি শিক্ষক

সাজু রায়
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

সেবুল আহমেদ
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

অনন্যা নাহা ডিউ
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

মাসুম
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

দেবাশিষ সরকার
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

অমিত রজক
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

সজীব সূত্রধর
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

মিজানুর রহমান
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

সায়েলা বেগম
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী

নন টেকনিক্যাল বিভাগের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ

মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ্
ইন্সট্রাক্টর (ম্যাথমেটিক্স)
ও বিভাগীয় প্রধান

মোঃ মাহমুদুল হাসান
ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজি)

মোঃ আশরাফউজ্জামান
ইন্সট্রাক্টর (ম্যাথমেটিক্স)

দীপংকর গোপ
ইন্সট্রাক্টর (কেমিস্ট্রি)

সাইফুল ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর (ফিজিক্স)

জাহিদ ফজল
ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)

মোঃ তোফায়েল আহমেদ
ইন্সট্রাক্টর (ম্যাথমেটিক্স)

সাজিয়া আফরিন
ইন্সট্রাক্টর (সমাজবিজ্ঞান)

আমিনা বেগম
ইন্সট্রাক্টর (ম্যাথমেটিক্স)

মাহমুদুল হাসান সিদ্দিকী
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ম্যানেজমেন্ট)

মোঃ সেলিম ভূইয়া
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (একাউন্টিং)

মোঃ হারিকুর রহমান
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)

মোঃ সামছু উদ্দিন গাজী
ল্যাব সহকারী

রুমি রানী দেব
ল্যাব সহকারী

সুমন চন্দ্র দাস
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী

একাডেমিক শাখায় কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল
কেয়ারটেকার

মোঃ মতিউর রহমান
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী

রেজিষ্ট্রার শাখায় কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ তোফায়েল আহমেদ
রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)

জুবনেল চাকমা
সহকারী রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)

জেনারেল শাখায় কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

মোহাম্মদ আবুল খায়ের
প্রধান সহকারী

হিসাব শাখায় কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

মলয় চৌধুরী
হিসাবরক্ষক

মোঃ শামছু উদ্দিন গাজী
ক্যাশিয়ার (ভারপ্রাপ্ত)

সুমন চন্দ্র দাস
ক্যাশ সরকার (ভারপ্রাপ্ত)

লাইব্রেরী শাখায় কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ নজরুল ইসলাম
লাইব্রেরিয়ান (ভারপ্রাপ্ত)

মোঃ মতিউর রহমান
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী

স্টোরে কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ নজরুল ইসলাম
স্টোরকিপার

নিরাপত্তা শাখায় কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ্
নিরাপত্তা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল
কেয়ারটেকার

জুবনেল চাকমা
ইলেক্ট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটর

মোঃ নজরুল ইসলাম
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী

মোঃ জাবেদ
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী (খন্ডকালীন)

মোঃ আব্দুল রহমান
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী (খন্ডকালীন)

মোঃ সামছুল হক
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী (খন্ডকালীন)

মোস্তাক আহমেদ
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী (খন্ডকালীন)

রমেশ রবি দাস
পরিচ্ছন্নতাকর্মী

সাগরিকা দাস
পরিচ্ছন্নতাকর্মী

প্রবন্ধ
গল্প
ও
ভ্রমণকাহিনী

কারিগরি শিক্ষার অগ্রগতি, ভবিষ্যত ও চ্যালেঞ্জ

প্রকৌশলী মোঃ আলাউদ্দিন
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

বহুল জনগোষ্ঠির ছোট এই দেশ আমাদের বাংলাদেশ। এদেশকে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে উন্নীত করতে হলে এদেশের মানব সম্পদকে কাজে লাগানোর কোন বিকল্প নেই। আর এই বহুল সংখ্যক জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণত করতে হলে জনগনকে দক্ষ, কর্মঠ, দেশ প্রেমিক, হাতে কলমে কাজ করার ও দেশে বিদেশে কর্ম পাওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। শুধু চাকুরী করার প্রবণতা নয়, উদ্যোক্তা হওয়ার মানুষিকতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আঠারো কোটি মানুষের ছত্রিশ কোটি হাত যদি কর্মক্ষম হয় তাহলে এদেশ উন্নত বিশ্বের কাতারে সামিল হতে পারবে। আর জনগনের হাতকে কর্মক্ষম করে তুলতে হলে কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১০ সালে কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে রোডম্যাপ প্রনয়ন করেন।ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষাকে ২০% এ উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারন করা হয়। তা বাস্তাবায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষা ২-৩% থেকে ১৭% এ উন্নীত হয়। বাংলাদেশে ২০৩০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষাকে ৩০% এবং ২০৪০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষাকে ৪০% এ উন্নীত করণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

কারিগরি শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে জনপ্রিয় করা এবং সমাজ, বিশেষ করে তরুনদের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে হবে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাঠামোকে আধুনিকায়ন করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষাতাকে গুরুত্ব দিয়ে তরুনদের অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

দক্ষতা প্রশিক্ষনের ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতি তথা অনলাইন দুর শিক্ষন এবং সরাসরি শ্রেনীভিত্তিক হাতে কলমে শিখনের মেলবন্ধন ঘটানো। ইন্টারনেট ও ডিভাইসের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

সরকারী-বেসরকারী অংশীদারীত্বের মাধ্যমে সারা দেশে শিক্ষার্থীদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট পৌছানো।

ইন্ডাষ্ট্রি-ইন্সটিটিউট লিংকেজ জোরদার করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গ্রাজুয়েটদের জন্য শিক্ষানবিশ ব্যবস্থা ছড়িয়ে দেওয়া।

শিল্প কারখানার চাহিদা অনুযায়ী কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন করা।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সবার জন্য সুলভ করার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে যুক্ত করা।

দেশীয় ও আন্তর্জাতি মানের দক্ষ, যোগ্য ও কর্মস্পৃহা সম্পন্ন জনবল গড়তে হলে প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থাপন করতে হবে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ল্যাব/ওয়ার্কসপ।

করিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ বিষয়ে ইতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন করা।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রধান ইস্যু ও চ্যালেঞ্জঃ

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী কায়িকশ্রমের মর্যাদা অনুধাবন করে, দলগত কাজের নিয়ম শৃংখলা শেখে এবং কর্ম অভ্যাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। শিক্ষার্থী যদি কোন বিশেষ বৃত্তি গ্রহণ নাও করতে পারে তবুও তার এ শিক্ষা মূল্যহীন হয়ে যায় না। তার অবসর, বিনোদন যা অন্য বৃত্তির সঙ্গে আত্মপ্রকাশে জীবনভর সহায়ক হয়। তাছাড়া শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে কর্মক্ষম, স্বাবলম্বী এবং অর্থ উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা যাতে ইচ্ছে করলে কর্মক্ষেত্রে নির্ভরশীল না হয়ে স্বাধীনভাবে আত্মমর্যাদার সাথে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এই লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে; বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করেছে, কেননা বেশীরভাগ শিক্ষার্থীর জন্য মাধ্যমিক

শিক্ষা হচ্ছে প্রন্তিক শিক্ষা। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা যাতে বেকার না থেকে আত্ম -কর্মসংস্থাননের ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্যই মূলত এই স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষার সামাজিক দিক থেকে অপচয় হ্রাস, বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী আকৃষ্ট করতে না পারাই বর্তমানে এই শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন বিবেচ্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অসচেতনতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অনাগ্রহও একটি বড় কারণ। শিক্ষার্থীদের অনাগ্রহের পেছনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশের প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকায় প্রধান। মানুষের অসচেতনতা এবং ভুল দৃষ্টিভঙ্গি এ শিক্ষা বিস্তারে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বিগত কয়েক বছর ধরে কারিগরি ও বৃত্তিমুলক শিক্ষায় অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা যদিও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে কিন্তু এই বৃদ্ধির হার আশাব্যঞ্জক নয়।

চ্যালেঞ্জ সমূহ ঃ

১। সরকারী বেসরকারী সকল কারিগরি প্রতিষ্ঠানে উন্নত ও যুগোপযোগী পাঠদান নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

২। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হার বৃদ্ধি করা।

৩। শিল্প কারখানার চাহিদা মোতাবেক কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন করা।

৪। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর মাধ্যমে কারিগরি ও বৃদ্ধিমূলক শিক্ষাকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজারের মানে উন্নীত করা।

৫। শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মাফিক ব্যবহারিক ক্লাস শতভাগ নিশ্চিত করা।

৬। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা। এক্ষেত্রে মানসম্মত পাঠদান ও শিক্ষার্থীদের তাত্তিক ও ব্যবহারিক ক্লাসে বিশেষ করে ব্যবহারিক ক্লাসে অধিক মনোযোগী করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৭। শিক্ষার্থী অভিভাবকদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক,কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের দায়িত্ববোধ সৃষ্টি।

৮। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সংঙ্গে তাল মিলিয়ে কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন ও নতুন প্রযুক্তিকে শিক্ষার্থীদের নিকট সহজ ও প্রানবন্তভাবে উপস্থাপনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ।

---o---

ভাবনায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লব

(The Forth Industrial Revolution in thought)

ফখরুল ইসলাম চৌধুরী

ইন্সট্রাকটর ও বিভাগীয় প্রধান, ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজী

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (বা ইন্ডাস্ট্রি ৪.০) হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। স্বয়ংক্রিয়করণ , উন্নত যোগাযোগ এবং স্ব-পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমস্যার বিশ্লেষণ এবং নিরুপণ করতে সক্ষম স্মার্ট মেশিন তৈরী করার জন্য বড় আকারে মেশিন-টু-মেশিন যোগাযোগ এবং ইন্টারনেট অব থিংস, কে একসাথে করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শব্দটির উৎপত্তি ২০১১ সালে, জার্মান সরকারের একটি হাই টেক প্রকল্প থেকে। একে সর্বপ্রথম বৃহৎ পরিসরে তুলে নিয়ে আসেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান ক্লস শোয়াব।

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত তিনটি শিল্প বিপ্লব ঘটেছে । ১৭৮৪ সালে প্রথম শিল্পবিপ্লবটি হয়েছিল পানি ও বাষ্পীয় ইঞ্জিনের নানামুখী ব্যবহারের কৌশল আবিষ্কারের মাধ্যমে। এরপর ১৮৭০ সালে আবিষ্কৃত হয় বিদ্যুত, যা পাল্টে দেয় মানুষের জীবনের চিত্র। এতে মানুষের কায়িক পরিশ্রম কমে যায়। এটি ছিল দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব। এর পর ১৯৬৯ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল ইন্টারনেট ।এর ফলে তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার ও দ্রুত তথ্য স্থানান্তরের মাধ্যমে মানুষের কাজের গতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এটিকে বলা হয় তৃতীয় শিল্পবিপ্লব।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে ভূমিকা রাখবে ,ক্লাউড কম্পিউটিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স (AI), । ইন্টারনেট অব থিংস (IoT):, আমাদের চারপাশের সকল বস্তু যখন নিজেদের মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে এবং নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবে, সেটাই ইন্টারনেট অব থিংস।

ইন্টারনেটের আর্বিভাবে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের পর তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার ও দ্রুত তথ্য স্থানান্তরের মাধ্যমে জীবন প্রবাহে কাজের গতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ডিজিটাল বিপ্লবের ছোয়ায় উৎপাদন ব্যবস্থায় ঘটবে অকল্পনীয় পরিবর্তন। যেখানে উৎপাদনের জন্য মানুষকে যন্ত্র চালাতে হবেনা, বরং যন্ত্র সয়ংক্রীয়ভাবে কর্ম সম্পাদন করবে এবং এর কাজ হবে আরও নিখুঁত ও নির্ভুল। শিল্পের উৎপাদন, চিকিৎসা, শিক্ষা, যোগাযোগ, প্রকাশনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এর প্রভাব হবে অত্যন্ত জোরালো। বাংলাদেশে এই বিপ্লবের সুযোগ গ্রহন করতে হলে আগাম ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আইওটি ,ব্লকচেইন ও রোবটিঙ ইত্যাদির ব্যবহার করতে দ্রুত কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে।

এই ডিজিটাল বিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের প্রধানতম লক্ষ্য হতে হবে এর উপযোগী সুদক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, আর এজন্য প্রয়োজন হবে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। আমাদের সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এই বিপ্লবকে এমন একটা রূপ দিতে হবে যা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য হুমকি না হয়ে যেন আশির্বাদ হয়ে আসে। এজন্য মানবিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে এর উপযোগী দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুত করতে হবে, তাহলেই প্রযুক্তির এই বিপ্লব হবে আমাদের জন্য আশির্বাদ।

গোপদে বিম্বিত বিশাল আকাশ ও শিক্ষা-ভাবনা

তোফায়েল আহমেদ
ইন্সট্রাকটর (নন-টেক) গণিত ও রেজিস্টার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

প্রথমদিনের স্মৃতির কথা মনে পড়ছে। সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠে তৈরি হতে হতে প্রায় ন'টা বেজে যাচ্ছে। নতুন উদ্দীপনা কাজ করছে নতুন পরিবেশে নতুন প্রতিষ্ঠানে ক্লাশ নিতে যাচ্ছি। প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ দেখতে চমৎকার। আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের এক অনিন্দ্য সুন্দও সুরম্য অট্টালিকা।ক্যাম্পাস দেখে আমি বিমোহিত। বিমোহিত আমি যে বাসায়ওঠেছি সে বাসার সকল ছাত্রদের আপ্যায়ন আর অতিথি পরায়নতায় আমি খুবই গর্বিত এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়ে।ক্যাম্পাস পরিদর্শনে প্রথমদিন বঙ্কিমবাবুর সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ল গোপদে বিম্বিত বিশাল আকাশ ।"আর দশটা গ্রামের মতই অজপাড়াগাঁ, নাম তার গোপায়া ।এই পাড়া গায়েঁ এতো উচুঁ বিল্ডিং যা হবিগঞ্জ জেলাশহওে এতদিন ছিলনা ।বঙ্কিম বাবুর রচনায় যেমনএসেছে, শরত কালের রাতের আকাশ যেমন দেখা যায়- পাড়াগায়েঁর কাদা মাটির রাস্তায় গরুর পায়ের খুরে সৃষ্ট গর্তে জমে থাকা পানিতে। ঠিক তেমনি জেলা শহরের সমস্ত আকর্ষণ এখানে ঠিকেও পড়ছে এই পাড়ারসম উচুঁ বিল্ডিংএ । যেখানে দেশের প্রায় চল্লিশটি জেলার শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করছে । জেলায় আর তো কোন প্রতিষ্ঠাক নেই যে চল্লিশ জেলার মানুষজন দেখা যাবে। যাই হোক ডায়াফেন্টাস সমীকরণের মতো জীবন সংসার এগিয়ে চলছে।এরমধ্যে অনেক কিছু দেখছি আর অনেক কিছু শিখছি।বিশেষ করে পরীক্ষা

ব্যাবস্হা আমকে ভাবিয়ে তুলে ।এ শিক্ষা দিয়ে জাতি কতদূর এগুতে পারবে ।একটি জাতির সফলতা নির্ভরকরে ব্যক্তি মানুষের সফলতার সমষ্টি দিয়ে।কিন্ত সফলতার সঙ্গাই আমরা হারাতে বসেছি।নকল করে ,লবিং করে যেন তেনভাবে পাশ করাকে অনেকে সফলতা মনেকরছে।একটি ইরাকি গল্পে সফলতার যে সঙ্গা দেয়া আছে তা এখানে প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে।বাবাকে ছেলে জিজ্ঞেস করছে ,বাবা সফল জীবন কাকে বলে ?বাবা বললেন আমার সাথে চল ,আজ আমর ঘুড়ি উড়াব ।বাবা ঘুড়ি উড়ানো শুরু করলেন ,ছেলে মনযোগদিয়ে দেখছে।আকাশে ঘুড়ি বেশকিছু উপওে উঠার পর বাবা বললেন,এই দেখো ঘুড়িটা এতো উচুঁতে কেমনে বতাসে ভেসে আছে। তোমার কী মনে হয় ? সুতার টানের কারণে ঘুড়িটা আরো উচুঁতে যেতে পারছেনা।হ্যা- তা ঠিক , সুতানা থাকলে ঘুড়িটা আরো কিছুটা উপরে যেতে পারতো।বাবা সুতা কেটে দিলেন ,ঘুড়িটা কিছুটা ওঠার পর নামতে শুরু করলো ।একটু পর নিচের দিকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।এবার বাবা ছেলেকে জীবন দর্শন শুনাচ্ছেন-শুনো ,জীবনে আমরা যে উচ্চতায় আছি বা থাকি সেখান থেকে মনে হয় ,ঘুড়ির সুতার মতো বন্ধন আমাদের উচুঁতে উঠতে বাধা দেয়।যেমন -পরিবার,শিক্ষক ,সমাজের অনুশাসন।বাস্তবে এই বন্ধনই আমাদের উচুঁতে টিকিয়ে রাখে,স্হির রাখে ,নিচে পড়তে দেয় না।তুমি যদি উপরে উঠতে চাও ,তাহলে এই বন্ধন ছাড়বেনা।পারিবারিক,সমাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধন আমাদের জীবনের উচ্চতায় টিকে থাকার ভারসাম্য দেয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও শিক্ষক কর্মচারী সুরক্ষা আইন এখন সময়ের দাবী...

মোঃ হাবিকুর রহমান
জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর নন টেক, বাংলা

শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর– এই বহুল প্রচলিত কথাটি কবে, কখন, কে প্রথম বলেছিলেন তা আজও জানা না গেলেও কারিগর শব্দটি বিশ্লেষণ করলে শিক্ষণের জন্য অত্যাবশ্যক দক্ষতাসম্পন্ন একজন মানুষকেই মনে পড়ে। বহুযুগ ধরে শিক্ষকের যে ভাবমূর্তি আমাদের মানসপটে চিত্রিত হয়ে আছে, তা হল শিক্ষক এমন একজন মানুষ যার আদর্শ নীতি, বিশ্বাস মূল্যবোধ, দর্শণ সেব অনুসরণযোগ্য এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তা অনুসরণ করে উত্তম মানুষ হয়ে উঠবে ও উন্নত সমাজ গঠন করবে এবং সুখী সমৃদ্ধ উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। বোধ হয় এমন একটি ধারণা থেকেই শিক্ষককে মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীর পেশাগত জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয়জ্ঞান দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটিয়ে এর সাহায্যে তাকে তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে গড়ে তোলেন এবং পরবর্তিত পরিস্থিতিতে তার বিষয়জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং কৌশল প্রয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রভূত ভুমিকা পালন করেন। একজন শিক্ষক নিজের জ্ঞান-গরিমা, চলন-বলন, নীতি-নৈতিকতায় শুধু নয় সমাজের দৃষ্টিতে ও যত উঁচুতে উঠবেন তিনি তত বড় শিক্ষক হবেন। এতদিন সেটাই হয়ে আসছে, ভবিষ্যতেও তা-ই হবে। এটা জানতেন বলেই কবি কাজী কাদের নেওয়াজের কবিতায় বাদশাহ আলমগীর 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদাকে" এত গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রাচীনকালে বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীরা নিজের ঘর ছেড়ে সুদূর গাঁয়ে গুরুগৃহে বাস করতো। বহু বছর সেখানেই বিদ্যাচর্চা চলতো। গুরুকুল নির্ভর পাঠ ব্যবস্থায় এই দীর্ঘ সময়ে তাদের মধ্যে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠতো। গুরু যিনি, তিনি তার শিষ্যদের বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন আর পাঠলাভের বাইরে অবসর সময়ে শিষ্যরা সবাই মিলে গুরুগৃহের গৃহস্থালি কাজগুলো সারতো। গুরু যখন ঘরের বাইতে বেরুতেন, পরম ভক্তিবশত শিষ্যরা গুরুর মাথায় ছত্র (ছাতা) ধরতো যেন রোদ বৃষ্টিতে গুরু কষ্ট না পান, সেই জন্যে গুরুর শিষ্যদের 'ছাত্র' (ছত্র ধরে যে) বলা হয়।
বর্তমানে যিনি শিক্ষকতা পেশায় আছেন, তিনিই জানেন শ্রেণিকক্ষে তিনি কতটা অসহায়। ক্লাসরুম কন্ট্রোল করা যেন রীতিমতো যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করার মত অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লাসের সামনের সারির কিছু শিক্ষার্থী শিক্ষকদের কথা শুনলেও পেছনের দিকের সবাই নিজেদের ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় ব্যস্ত থাকে। বার বার অনুরোধ করার পরেও ২/১ মিনিটের জন্য শান্ত হলেও শিক্ষক যখন আবার পড়াতে শুরু করেন তারাও আবার পূর্বের মতো নিজেদের ইচ্ছামত আলাপচারিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আমরাও তো একদিন ছাত্র ছিলাম। শিক্ষকগণ ক্লাসে আসলে সবাই শান্ত হয়ে যেতাম। স্যার যা ক্লাসে বলতেন তাই করতাম। আজকের এই উল্টো চিত্রের জন্য দায়ী কে ?শ

শতাব্দীর পরিবর্তনে ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক দিন দিন যেনো শুধুমাত্র ক্লাসরুম পর্যন্তই বিরাজমান। এর কারণ নানারকম সামাজিক অবক্ষয় শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের বৈশ্বিকভাবে গড়ে উঠা নানারকম নেতিবাচক ধারণা ইত্যাদি। ক্লাসে পড়া না পারা, অনিবার্য কোনো কারণে দেরিতে স্কুলে পৌঁছানো বা ছোটখাটো ভুলের জন্য জীবনে অসংখ্যবার শিক্ষকের ধমক ও বকা খেয়েছি, জোড়াবেতের ঘা খেয়েছি, সকলের সামনে বেঞ্চের ওপর দাঁড়াতে হয়েছে, দুই আঙ্গুলের মধ্যে পেন্সিল ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে হাতের আঙ্গুল ব্যথা করে দিয়েছেন। তারপরও শিক্ষকের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস করিনি কখনো। এমনকি বাড়িতে যেয়ে বাবা মাকেও শাস্তির ভয়ে ও লজ্জায় বলতে পারিনি কখনো।

আমাদের শিক্ষকদের দেখলে এখনও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়ে আসে। যে শিক্ষা মানুষের আচরণের পরিবর্তন এনে দেয়, সে শিক্ষা আমরা প্রতিষ্ঠান থেকেই অর্জণ করেছিলাম।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হয়েছে যে, শিক্ষার্থীরা নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে চায় না, এলেও ক্লাস রুমে যেতে চায় না। ক্লাস রুমে যারা যায় তারাও ক্লাস লেকচার শোনার প্রতি মনোযোগী হয় না। লেকচার শোনার পরিবর্তে স্মার্টফোন ও ফেসবুক চ্যাটিং যে তারা অনেক বেশি মনোযোগী। বাড়ির কাজ দিলে সেগুলো তারা করবে না, প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মানতে চায় না, প্রতিষ্ঠানের সময় মেনে ক্লাসে আসবে না, শৃঙ্খলা মানবে না। এসব নিয়ে প্রশ্ন করলে নানা অজুহাত দেখায়। এমনকি এমন কিছু অভিভাবক আছেন যারা তাদের সন্তানদের পক্ষে নিজেরাই নানা অজুহাত দেখান। কিছু শিক্ষার্থী বাদে অধিকাংশ শিক্ষার্থীরাই লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ শূণ্যের কোটায়।'

অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের রেজাল্ট নিয়ে ব্যস্ত, সন্তানের আচরণিক পরিবর্তনের চেষ্টা নাই বললেই চলে। শিক্ষার্থীদের শাসন ব্যবস্থা তুলে নিয়ে আজ সমস্ত শিক্ষকদের কাঠের পুতুল বানিয়ে রাখা হয়েছে। আজ আমরা শিক্ষার্থীদের ধমকের সুরে কথা বলতে পারি না। অনুরোধ করে বললেও তারা আমাদের পাত্তা দেয় না।

এ কী হলো?.... আমরা কী করব? কীই বা আমাদের শিক্ষকগণের করার আছে? মিনিমাম শাসন করলেও কত ধরণের অপমান, অপদস্ত হতে হয় শিক্ষককে। আর কত্তদিন এভাবে চলবে....?

বর্তমান সময়ে শিক্ষক হত্যাসহ দেশব্যাপী শিক্ষক নির্যাতন ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরিচ্যুতির ঘটনা মারাত্মকভাবে বেড়েছে। এসব ঘটনায় বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। শিক্ষা ও জাতিকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে একটি অশুভ চক্র। অতি সম্প্রতি নড়াইল সদরের মির্জাপুর ইউনাইটেড ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ স্বপন কুমার বিশ্বাসকে পুলিশের উপস্থিতিতে জুতার মালা পরিয়ে অপমান ও অপদস্থ করা এবং মেধাবী শিক্ষক উৎপল কুমার সরকারকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনা সেই বিষয়েরই ইঙ্গিত বহন করছে। আমার ভাবতে অবাক লাগে যে শিক্ষকদের এত সংগঠন থাকা সত্ত্বেও একটি সংগঠন ও নড়াইলের শিক্ষক লাঞ্ছনার ও সাভারে শিক্ষক হত্যার জুড়ালো প্রতিবাদ করল না কেন? তারা কী অপেক্ষা করছে কবে তাদের নিজেদের গলায় জুতার মালা আসবে? ওই জুতার মালা শুধু শিক্ষক স্বপন কুমার বিশ্বাসের গলায় নয়, সবার গলাতেই ওই মালা ঝুলছে। আশা করব সবাই যাতে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানান। রুখে দাঁড়ালেই এসব অন্যায়ের প্রতিবিধান সম্ভব হবে। না হলে এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি বার বার ঘটতেই থাকবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়ম থেকে শুরু করে ঘুষ, জালিয়াতি. প্রশ্নফাঁস, মাদকাসক্তি ইত্যাদি নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে ব্যাহত হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা। তাই সরকারের উচিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণের পাশাপাশি শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন ভাতা, রাষ্ট্রীয়ভাবে নিশ্চিত করতে হবে কেননা আর্থিকভাবে সমস্যায় জর্জরিত শিক্ষক জাতি গঠনে তার মেধা ও মননের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করতে পারবে না।

শিক্ষকদের এভাবে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা থাকলে কিছুদিন পর দেশে আর শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যাবে না। বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে তাঁরা গুণগত শিক্ষা দেওয়ার তাগিদ, শক্তি বা সদিচ্ছার কোন কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। এতে ক্ষতির মাত্রা যে কত বেশি হতে পারে সেটা আন্দাজ করার জন্য নিচের ছোটগল্পটিই যথেষ্ট।

বহুদিন আগে কোন এক নিরক্ষর গ্রামে কোথা থেকে এক শিক্ষক এসে বাচ্চাদের পড়ানো শুরু করলেন। একদিন সেই গ্রামের বুদ্ধিমান মাতব্বর ভাবলেন, ওই ব্যাটা মাস্টার তো অসহায় বলেই ওখানে আছে। ওকে এত বেতন দিয়ে কী হবে। বেতন কমিয়ে দিলেন। দেখলেন, কোন অসুবিধা নেই। ও আছে, পড়াচ্ছে। তাহলে তো আরও কমানো যায়, কমালেন। তাও-ও যায় না। এরপর মাতব্বর ভাবলেন, ওজে আসলে বেতন না দিলেও হবে। চাল, ডাল, লাউ, মুলা দিলেই ওর দিব্যি চলে যাবে। তাও চলল কিছুদিন। কিন্তু একদিন হঠাৎ সেই শিক্ষক উধাও। কী আর করা! অন্য আর এক শিক্ষককে ধরে আনা হলো। তিনি একদিন পড়িয়েই আগের যে শিক্ষক প্রথম যে বেতন পেতেন, তার তিনগুণ দাবি করে বসলেন। কেন? কারণ এ গ্রামের শিশুরা সব অক্ষর উল্টো করে লেখে। আগের শিক্ষক এভাবেই নীরবে তাঁর অপমান ও বঞ্চনার প্রতিশোধ নিয়ে গেছেন।

শিক্ষকেরা ফেরেশতা নন। একেবারে শেষ সম্বল না হোক, তাঁদের সবচেয়ে বড় যে সম্বল, সেই সম্মান যদি তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, এ ধরণের প্রতিশোধ নেওয়ার অপরাধ তারা করতেই পারেন। একদিকে তাঁদের ওপর ইচ্ছেমতো যত্রতত্র যেমন তেমন শাস্তি আরোপ করা, সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও বেতন ভাতা দিতে পিছিয়ে রাখা আর অন্যদিকে তাঁদের কাছ থেকে গুণগত শিক্ষাদান আশা করা "সোনার পাথরবাটির চেয়ে কম হাস্যকর নয়।"

মানব শিশুর জন্মের পর থেকে বাবা-মা যেমন তাদের ভালোবাসা, স্নেহ মমতা দিয়ে সন্তানকে বড় করে তোলেন, তেমনই শিক্ষকগণ শিক্ষার আলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করে যান। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমেই নয়, বাস্তবমুখী ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে একজন সুশৃঙ্খল পরিশ্রমী সৎ ও সাহসী মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার শিক্ষাটা প্রদান করেন আমাদের শিক্ষকেরা। তাদের স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা আদর ও শাসন এবং নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থী প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে সৎ, সাহসী ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। সমাজ ও জাতি গঠন, দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়নে দেশের সাধারণ ভাগ্য উন্নয়নে, বিশ্বের দরবারে নিজ দেশের গৌরবময় অবস্থান গড়ে তুলতে একজন শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে একটি শিক্ষিত ও সভ্য জাতি। তাই জাতির স্বার্থেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের শিক্ষক নিরাপত্তা আইন ও যথাযথ প্রয়োগ এখন সকল শিক্ষকের প্রাণের দাবী।

হতাশা ও আত্মহত্যা

মাহমুদুল হাসান সিদ্দিকী
জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ননটেক (ব্যবস্থাপনা)
হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

আমরা এমন একটি সমাজে বাস করছি লক্ষ্য করলে দেখব কেউ যেন সুখে নেই। হতাশা আর না পাওয়ার গল্প সর্বত্র। মানুষ নানান কারণে হতাশ হয়। হতাশা থেকে মানুষের মনে অভিমান জন্ম নেয়। সেই অভিমান থেকেই অনেকে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। আমাদের সমাজে হতাশা তৈরীর একটি বড় কারখানা হলো মানুষের অবিবেচক মন্তব্য। আমাদের সমাজ এমন একটি সমাজ যা আপনাকে আপনি যে অবস্থানেই থাকেন না কেন সুখী হতে দিবেনা। আপনি বেকার আপনাকে নিয়ে সমাজে সমালোচনা করবে। আপনি প্রাইভেট জব করেন, কেন সরকারি জব করেন না সেজন্য আপনাকে হতাশ করে দিবে। আপনি সরকারি জব করেন, কেন বিসিএস ক্যাডার হলেন না আপনাকে হতাশ করে দিবে। বিসিএস ক্যাডার কিন্তু কেন ম্যাজিস্ট্রেট, এএসপি হতে পারলেন না আপনাকে হতাশ করে দিবে। সমাজ আপনাকে যা আছে তা নিয়ে সুখী হয়ে বাঁচতে শেখায় না। ভুল চিন্তার কারণে আমরা ছোট কিন্তু এতো দামী জীবনটায় আনন্দের চেয়ে হতাশায় বেশীর ভাগ সময় নষ্ট করে দেই।

কে সাদা, কে কালো, কার বেতন কম, কার বেতন বেশী, এসব চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে সুখী হওয়ার চেষ্টাটাই হয়ত করা হয়ে উঠে না। দৃষ্টিভঙ্গি বদলালে হয়ত জীবনটা আরোও সুন্দর হতে পারে। সবচেয়ে বড় নসিহত হলো মৃত্যু। একদিন আমাকে মরে যেতে হবে এ কথাটি যদি আমরা স্মরণে রাখতে পারি তাহলে দুনিয়াবী কোন কিছু হয়ত আমাদের এতো সহজে হতাশ করতে পারবে না।

একটি ভ্রমণ ও আনন্দগাঁথা

মোঃ সেলিম ভূইয়া
জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (হিসাববিজ্ঞান) ননটেক

কাকডাকা ভোরে ছাত্র ফয়সাল ফোন দিয়ে ঘুম থেকে উঠালো। নামাজটা সেরে দ্রুত প্রস্তুত হতে শুরু করলাম। পাশের রুমে থাকা মাহমুদ স্যারকে ফোন দিয়ে বললাম আর ঘুমানো যাবে না দ্রুত ফ্রেশ হয়ে রেডি থাকুন কারন উনার আবার ঘুমের বদঅভ্যাস আছে।

হ্যাঁ, কথা বলছি, হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কম্পিউটার সাইন্স টেকনোলজি কর্তৃক আয়োজিত 'শিক্ষা সফরের' নিয়ে।

খুব সকালে সূর্যিমামা হয়তো তখনো ঘুমিয়ে আছে, ছাত্র, শিক্ষকদের আনাগোনায় ধুলিয়াখাল পয়েন্ট সরব আজ। ছাত্রদের আজ বিভিন্ন ড্রেসকোডে ভালোই লাগছে কারণ আজ পছন্দসই পোশাক পড়তে নেই মানা।

সকাল ৭টা বাসে উঠে পড়লাম। দিনটাও বেশ ভাল মনে হচ্ছে। বাসে পেয়ে গেলাম প্রিয় মানুষ বরকত স্যার ও মাহমুদ।

আসল কথাটাই এখনো বলা হয়নি আমরা যাচ্ছি, রাতারগুল (বাংলাদেশে একমাত্র সোয়াশ ফরেস্ট) এবং মেঘালয় রাজ্যের সীমানা ঘেষা বাংলার অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভোলাগঞ্জ (সাদাপাথর)।

রাস্তার দুপাশের অপরূপ সৌন্দর্যকে পেছনে ফেলে বাস দুর্বার গতিতে ছুটে চলছে আমাদের গন্তব্যে। বাসে ছাত্রদের বেসুরা কণ্ঠের গানে গানে আমরাও তাল মিলালে এক অন্যরকম আনন্দধারার সৃষ্টি হয়।

বাস চলতে থাকলো আনন্দে, নাচে, গানে, আর কৌতুকে। একদিনের জন্য ছাত্র-শিক্ষক বন্ধু হয়ে গেলাম আর এক্সপ্লোর করলাম ভালো ছাত্রের পাশাপাশি তারা হলো গায়ক, চমৎকার ক্যাপ্টার, প্রশংসা করার মত অভিনেতা এবং একজন আদর্শ নেতার মত সাংগঠনিক।

রাতারগুল পৌছলাম তবে আনন্দে বাধ সাধলো বৃষ্টি। মাহমুদ স্যারের মত সুন্দর চেহারার দিনটা হঠাৎ না জানি ..... মত ঘুমোট হয়ে গেল। কিন্তু বরকত স্যারের মত আনন্দ প্রিয় মানুষ যেখানে আছে সেখানে বৃষ্টি আর কোন বাঁধাই হয়ে দাঁড়াতে পাড়লো না। ক্ষণে ক্ষণে স্যার কবিতা, গান আর কৌতুক দিয়ে বৃষ্টির নিরানন্দকে বিদায় জানালেন। রাতারগুল আহা! কি সুন্দর, আল্লাহতা'আলার সৃষ্টি। হাওরের ভিতর বন। বনের বুক ভেসে বড় গাছের ডালের পাশ দিয়ে মাঝি নৌকা বেয়ে যায় অবিরত আর সামে আমাদের বেসুরা কণ্ঠের গান "তীরহারা ঐ ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে...."। আহা! কি আনন্দ। কিছুটা কাকভেজা হয়ে রাতারগুল থেকে আবার বাসে চড়লাম, গন্তব্য সাদাপাথর। নেচে গেয়ে বিকালে গেছিরাম সেখানে।

মেঘালয়ের পাহাড়ে মেঘের খেলা সাথে দেখা গেল বিকালের রংধনু কি অপরূপ সৌন্দর্য।

ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর পৌছে মন ভরে গেল ধোলাই নদের স্বচ্ছ পানি সাথে চমৎকার সব ছোট-বড় সাদা পাথর দেখে।

তারপর সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের পাথর ডুবন্ত পানিতে এক অন্যরকম উচ্ছ্বাস দেখলাম। এ যেন কবি রাসুকান্ত ভট্টাচার্যের আঠারো বছর বয়সের মতো।

পানিতে আনন্দ অশ্রু দিয়ে আমাদের এবার যাত্রা শেষ করার পালা। সন্ধ্যায় শেষ হয়ে রাত আমরা সবাই বাসে চড়ে বসলাম।

বাস চলতে থাকলো মেসির মত দুর্বার গতিতে। এখন রাত তাই নাচ হবে উড়াধুড়া। হ্যাঁ, এবার নাগিন ড্যান্সে ছাত্রদের মাতালেন জুয়েল স্যার, হাবিবুর স্যার।

আমাদের ভ্রমণ প্রায় শেষের দিকে। আমার কাছে মনে হলো ভ্রমনটাই ইংরেজি Present Perfect Tense এর মত অর্থাৎ কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যার প্রভাব বিদ্যমান থাকে।

সময়ের শেষ পর্যায়ে বাসে কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগীয় প্রধান শাকিল আহমেদ চৌধুরী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য্যমুলক কথা বলেন।

ভ্রমণ শেষ হয়ে গেল কিন্তু আমার ভ্রমণের প্রভাব রয়েই গেল তাই বাসায় এসে ফ্রেশ হওয়ার পর বার বার গেয়েই উঠি

"তুমি জ্বালাইয়া গেলা মনের আগুন, নিভাইয়া গেলা না।

সমাপ্ত

শপথের গল্প

মোহাম্মদ শামছুল হক
ক্রাফট ইন্সট্রাকটর (কম্পিউটার), হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
সংযুক্তি কর্মস্থল : ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ময়মনসিংহ
রোভার স্কাউট লিডার

শপথ, ইংরেজী শব্দ Oath, Vow, Promise. আভিধানিক অর্থে প্রতিজ্ঞা, অঙ্গিকার, হলফ, ব্রত ইত্যাদি বুঝায়। প্রতিটি মানুষ জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে শপথ নিয়ে থাকে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শপথের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিবাচক সকল শপথই জীবনকে সুন্দর করে। শপথের যথাযথ অনুশীলন ব্যক্তি জীবনকে যেমন সুন্দর করে তেমনি সমাজ বিনির্মাণ কিংবা রাষ্ট্রকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে।

শপথ পালনের জন্য নিজের সততা, আন্তরিকতা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা তথা উন্নত ব্যক্তিত্ব সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এথেনীয় রাষ্ট্র নায়ক ও কবি সোলোন শপথ প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'একটি শপথের চেয়ে চারিত্রিক মহত্ত্বে বেশি আস্থা রাখুন' বস্তুতঃ সকল শপথ পালনের মূলেই রয়েছে দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আর উন্নত ব্যক্তিত্ব। কাউকে বাধ্য করে শপথ পালন করানো যায় না। তবে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আইনের কাঠামোর মধ্য দিয়ে যে সকল শপথ পাঠ করানো হয়/শপথ নেয়া হয়তা যথাযথভাবে পালন করতে হয়। অন্যথায় শপথ ভঙ্গের দায়ে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়।

ব্যাক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বহুপূর্ব থেকে শপথ পাঠের কথা জানা যায়। তেমনি এক শপথের গল্প হল- আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীসে এথেন্সে পেরিটলেসের শাসনামলে প্রত্যেক যুবককে আঠারো বছর বয়সে পর্দাপণ উপলক্ষ্যে শপথ বাক্য উচ্চারণ করানো হতো, "জন্মের সময় যে এথেন্সকে আমি পেয়েছিলাম, মৃত্যুর সময় এর চেয়ে উন্নততর এথেন্সকে যেন পৃথিবীর বুকে আমি রেখে যেথে পারি।"

প্রাচীন এথেন্সের এই শপথের গল্প অসাধারণ। কারণ তরুণদের এমন আত্মপ্রত্যয়ী শপথকে ঘিরেই গ্রীসে গড়ে উঠেছে গণতন্ত্র, আইনের শাসন এমনকি সভ্যতাও।

অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লবের সূচনাতে ও ছিল শপথ। আজ থেকে ২২০ বছর আগে ফরাসী রাজা লুইয়ের পতন ঘটানোর জন্য শপথ নেওয়া হয়েছিল প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি টেনিস কোর্টে। দিনটি ছিল ২০ জুন, ১৭৮৯ সেই প্রথম রাজার স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা খর্ব করতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ করেছিল ফরাসীবাসী। তারা শপথ নেয়, "একটি উপযুক্ত সংবিধান প্রনয়ণ না করা পর্যন্ত আমরা আর কখনো বিচ্ছিন্ন হব না" এর ২৩ দিন পর বাস্তিল দুর্গের পতন হয়। রাজতন্ত্রের উৎখাত হয়। পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ফরাসী প্রজাতন্ত্র।

এতো গেল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শপথের গল্প। তেমনি এক অসাধারণ শপথের উচ্চারণ রয়েছে স্কাউট আন্দোলনের মূলনীতিতে। স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ব্যাডেন পাওয়েল ১৯০৭ সালে ইংল্যান্ডের ব্রাউনসী দ্বীপে মাত্র ২০ জন বালককে নিয়ে প্রথম পরীক্ষামূলক স্কাউট ক্যাম্পের আয়োজন করেন। সেই থেকে স্কাউট আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছে এক অন্যান্য শপথ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল স্কাউট নিজ নিজ আত্মমর্যদার উপর নির্ভর করে এই শপথ পালন করে আসছে। স্কাউট শপথের প্রতিটি শব্দ, বাক্যের সুনিপুণ বিন্যাস পুরো শপথটিকে করেছে অনিন্দ্য সুন্দর আর সর্বজনীন।

শত বছর পেরিয়ে আজও স্কাউট শপথের প্রতিটি শব্দের আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চারণ প্রতিটি স্কাউটকে অনুরনিত করে আসছে। শপথটি হল-

"আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে,

* আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
* সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
* স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।" (আল্লাহ্ শব্দের পরিবর্তে নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস মতে স্রষ্টার নাম উচ্চারণ করা যাবে।)

স্কাউট শপথ/প্রতিজ্ঞাটি স্কাউট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মৌলিক বিষয়। স্কাউট শপথ গ্রহণ কোন বাধ্যতামূলক বিষয় নয়। স্বতঃস্ফুর্তভাবে একে যে গ্রহণ করে তার জন্য তখন এই শপথ মেনে চলা নৈতিক দায়িত্বে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে তার আত্মমর্যাদা তাকে শপথের যথাযথ অনুশীলন করতে তাকে সহায়তা করে থাকে।

আসুন, আমরা শপথ গ্রহণ করি- জীবনকে সুন্দর করার জন্য, সমাজকে বির্নিমাণের জন্য আর পৃথিবীকে যেমন পেয়েছি তার চেয়ে একটু শ্রেষ্ঠতর করে রেখে যাওয়ার জন্য- স্রষ্টা এ কাজে আমাদের সহায়তা হবেন নিশ্চয়ই।

আমার ভ্রমণের ইতিকথা

আবু নাসের মোহাম্মদ তৌকির
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন টেকনোলজি (৭/১)

ভ্রমণ মানেই রোমাঞ্চকর এক অভিজ্ঞতা। নতুনকে দেখা ও জানার আনন্দ সাথে বাঁধনহারা উত্তেজনা। তবে বর্তমান আধুনিক যুগে প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে। সবাই একঘেয়েমি হয়ে যাচ্ছে। আর এই একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মানুষের মনে ভ্রমণের তাগিদ প্রচন্ডভাবে বেড়ে যায়।।

আমার ছোট বেলা থেকে বাংলাদেশের সুন্দর সুন্দর স্থানগুলো ঘুরে দেখার অন্যতম একটা শখ ছিলো কিন্তু কোনোভাবেই শখ পূরণ করতে পারি নি, তবে। বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক জায়গা ও পার্কে ভ্রমণ করেছি। আমার প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয় ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে। প্রকৃতির অসাধারণ। জায়গাটির নাম হচ্ছে সাজেক। রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থেকে খাগড়াছড়ি যাবার পথে সাজেকের নবনির্মিত রাস্তা চোখে পরে। রাঙ্গামাটি জেলার সর্বউত্তরের মিজোরাম সীমান্তে অবস্থিত সাজেক ভ্যালি। এর অপূর্ব নৈসর্গিক যেন সৌন্দর্য্য তুলনাহীন। আচ্ছা কল্পনা করুন তো, আপনি ১৮০০ ফুট উচু একটা পাহাড়ে দাড়িয়ে আছেন। চারপাশ দিয়ে মেঘ বয়ে চলেছে। মেঘের আড়ালে খানিক দূরের বস্তুও আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। মাঝেমাঝে খুব কাছে এসে মেঘ গুলো ছুয়ে দিয়ে আপনার শিহরণ বাড়িয়ে দিচ্ছে আর এই অনুভূতিগুলো প্রকাশ করা যাবে না যারা মেঘ ও প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে গেলেই অনুধাবন করতে পারবেন।

হবিগঞ্জ থেকে আমরা ১০ জন মাইক্রোবাসে রওনা দেই নারায়ণগঞ্জ এর উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে আমরা যুক্ত হই বিডি ক্লিনের প্রায় ২৫০ জন ছেলে মেয়ের সাথে। আমাদের এই ভ্রমণটির উদ্যোগ গ্রহন করে বিডি ক্লিন যেখানে ছিলো সারা বাংলাদেশ থেকে বিডি ক্লিনের সব দায়িত্বশীলরা। প্রথমত সাজেক ভ্রমণের প্রবল আগ্রহ আর অন্যদিকে অন্যান্য জেলার মানুষের সাথে ভ্রমণ এটি অসাধারণ একটি অভিজ্ঞতা। যেই সাজেকের গল্প এতোদিন শুধু লোকমুখে শুনেই এসেছি, এবার সেই স্বপ্ন সত্যি হবার পালা। শান্তির বাস আমাদের খুব। ভোরে নামিয়ে দেয় খাগড়াছড়ির একটি হোটেলে। আমরা পুরো গ্রুপে ছিলাম। টোটাল ২৫০ জন। ওখানে নেমে আমরা নাস্তা করে নেই। তারপরে আগে থেকে ঠিক করে রাখা চাদের গাড়িতে করে রওনা দেই মেঘের রাজ্যে হারিয়ে যেতে। আমরা কয়েকজন প্লান করলাম চাদের গাড়ীর উপরে উঠে যাব কিন্তু ব্যাপারটা অনেক রিস্ক ছিলো তারপরও আমরা ড্রাইবারকে বুঝিয়ে উপরে উঠলাম বিশ্বাস

করেন উপরে না উঠলে এই অসাধারন দৃশ্য এত কাছ থেকে দেখতে পেতাম না। চারপাশে সারি সারি পাহাড়! দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ আর সবুজ। মাঝেমাঝে ওই দূরে কিছু ছোট ছোট জুম ঘর চোখে পরে। উচু নিচু পাহাড়ের মাঝে সাপের মতো। একেবেকে চলা রাস্তাতে আমাদের গাড়ি সামনে এগুতে লাগলো। এই দুর্গম এলাকাতেও পাহাড়ের মাঝে হাড় ভাঙ্গা খাটুনি করে গাড়ি চলাচলের জন্যে রাস্তা তৈরি করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। পথে চলতে চলতে দুপাশে চোখে পরলো পাহাড়িদের বাড়ি ঘর। দুপাশে ছোট ছোট বাচ্চারা হাসিমুখে দাড়িয়ে ছিলো। চকলেটের জন্যে। এভাবে চলতে চলতে আমরা পৌছালাম মাসালং বাজার' আর্মি ক্যাম্পে। এখানে এসে সব গুলো গাড়ি একত্রে জমা হয়। তারপরে আবার যাত্রা শুরু। দীঘিনালা থেকে সাজেক পৌছাতে প্রায় দুই ঘন্টার মতো সময় লাগলো। আমরা যখন সাজেকে পৌছালাম তখন ব্যাগ নিয়ে দৌড় দিলাম আমাদের জন্যে আগে থেকেই বানানো তাবুতে। সেখানে বিশাল ২৫০ জন বিশিষ্ট তাবু ও। মেয়েদের জন্য রিসর্টে বুক করে রাখা ছিলো। তারপর ফ্রেশ হয়ে বের হলাম। যতদূর চোখ যায় শুধু দিগন্ত বিস্তৃত সারি সারি পাহাড় আর পাহাড়। আর তার। মাঝে মাঝে জমে আছে সাদা মেঘের ভেলা! এ যে কত সুন্দর যে সামনাসামনি না।। দেখেছে সে কোনোদিনই অনুভব করতে পারবে না। মনে হচ্ছিলো যে, এই দৃশ্যটা। আজীবন দেখলেও দেখবার স্বাদ মিটবে না! সবাই বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে।। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এই অপূর্ব সৃষ্টি উপভোগ করলাম। বিকেল বেলা। রোদটা একটু ধরে এলে হ্যালিপ্যাডে গেলাম সূর্যাস্ত দেখতে। পুরো পার্বত্য চট্রগ্রামে এরিয়া বাংলাদেশ আর্মির নিয়ন্ত্রণে। সাজেকও তার ব্যতিক্রম না। সাজেকে সেনাবাহিনীর ব্যবহার করার জন্যে দুইটা হ্যালিপ্যাড আছে। দুটো প্যাড। থেকেই ওই বিশাল আকাশের অপূর্ব ভিউ পাওয়া যায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলো পরে সবাই তখন আড্ডা দিতে ব্যস্ত। আমি কয়েকজনকে বের হলাম রাতের সাজেক। দেখতে। একটা সিটির সত্যিকারের সৌন্দর্য ফুটে উঠে রাতের বেলা তার বাজারের মধ্যে। রাতের আকাশে শত সহস্র নক্ষত্রকে বন্ধু করে আমি একা একা হাটতে লাগলাম সাজেকের এ মাথা থেকে ও মাথা। মাঝে চেখে দেখলাম পাহাড়ি ডাব, বাশ কোরাল আর উপজাতীদের ক্যাফেতে বানানো গরম কফি। আরেকটু রাত। বারতেই সবাই ডিনার করে নিলাম। আমাদের একটা গ্রুপ তখন গানের আসরে ব্যস্ত। আর আমাদের রুম তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। আলো ফোটার আগেই উঠতে হবে। একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য দেখবো কাল সকালে।

পরের দিন ভোরে ৪.৩০, পূব আকাশে হালকা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। সমগ্র আকাশ আলোর বর্ণিল ছটায় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে! যেনো কিসের এর আগমনের প্রতিক্ষায় খুব দ্রুতই রেডি হয়ে আমরা বের হয়ে গেলাম কংলাক পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। আকাশের রং তখন ধীরে ধীরে আরো উজ্জ্বল হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিকট আকাশের নির্দিষ্ট একটা অংশ অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে।
উঠতে লাগলো। আমাদের অপেক্ষার প্রহর বারতে লাগলো। আর তার পরপরই। উদয় হলো সূর্যের। হাজার হাজার বছরের পুরনো সেই সূর্য! শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যা কিনা প্রতিদিনই এভাবে প্রবল দম্ভে হাজির হচ্ছে সবুজ এই। পৃথিবীর দুয়ারে। এতো কাছ থেকে জীবনে এই প্রথমবারের মতো দেখা! আমরা প্রায় ৩০০ জন রওনা হলাম সাজেক ভ্যালিক সর্বোচ্চ চূড়ায় 'কংলাক পাহাড়। এই পাহাড়টা আমার কাছে কিছুটা রহস্যঘনই মনে হলো। এর উচ্চতা সমতল থেকে প্রায় ১৮০০ ফুট উপরে। পাহাড়টায় চড়ার ট্রেইলটা মোটামুটি সহজই, যদিও ৩০-৪০ মিনিটের মতো লাগবে। এতো উচু পাহাড়ের মধ্যেও মানুষের। বসবাস। এখানে কয়েক শত বছর ধরে (তাদের ভাষ্যমতে) বসবাস করে আসছে। 'লুসাই' আর 'ত্রিপুরা উপজাতি। স্থানীয় এক ত্রিপুরা দোকারদারের সাথে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা করলাম। কাছ থেকে ঘুরে ঘুরে দেখলাম তাদের জীবনযাপন, পরিবেশ, সংস্কৃতি!! সবাই তখন ছবি তোলায় ব্যস্ত। আমি পুরনো অভ্যেস মতো একা একা তাদের পুরো পাড়া ঘুরে দেখলাম। এই পাড়ার অর্ধেক হিন্দু আর অর্ধেক খ্রীস্টান। ওখানে একটা খ্রীস্টান গীর্জা আর কবরস্থান আছে। তারপর আমরা সবাই ঐ জায়গায় পরিচ্ছন্নতার ইভেন্ট করি এবং শপথ করি। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলার। এই সম্পূর্ন গ্রুপটি পরিচালনায় ছিলেন বিডি ক্লিনের প্রতিষ্টাতা ফরিদ উদ্দিন ভাইয়া। ভাইয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এতজন মানুষ নিয়ে এত বড় একটি ভ্রমণ সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়েছিলো। তারপর সকালের নাস্তা করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। একটু পরেই শুরু হবে আরেকটা ট্রেকিং কমলক ঝর্ণা'। এই ঝর্ণাটার আরেক নাম 'পিদাম তৈসা' ঝর্ণা।। কেউ কেউ আবার 'লুসাই ঝর্ণা' বলেও ডাকে। সকালে কংলাকে যাওয়ার পথে। একটা বাশ কিনেছিলাম। সেটা সম্বল করেই যাত্রা শুরু করলাম। তখনও ভাবতে। পারি নি যে সামনে কি আছে :/ এই ঝর্ণাটা ভূমি থেকে প্রায় ১৫০০ ফুট নীচু তে। বুঝতেই পারছেন অবস্থাটা। নামার সময় শুধু খাড়াই বেয়ে নামতেই থাকলাম।

কোনো সমতলের নাম গন্ধও নেই। একদম নীচের দিকে ঢালু খাড়াই! নামছি তো নামছিই! তখন একবারও মাথায় আসে নি যে এটাতে বেয়ে উঠতে কতটুকু ভর্তা হতে হবে। যদিও সেখানে সবাই যায় নি দীর্ঘপথ হাঠার ভয়ে কিন্তু আমরা ১০/১২ জন মিস করি নি। যাই হোক, প্রায় ৪০ মিনিট একটানা নীচের দিকে আকাবাকা পথে নামতে নামতে ঘন সবুজের মাঝে ঝর্ণার শব্দ শুনতে পেলাম। বৃষ্টি না। থাকায় ঝর্ণাতে খুব পানি ছিলো মোটামুটি। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম যে ভরা বর্ষায় এর যৌবণ কতটা ফুলে ফেপে উঠে। প্রায় ঘন্টা খানিক সবাই মিলে ভিজলাম, ভিজালাম। এবার এরপরে উঠার পালা এর আগে আরো অনেক ট্রেইলে গিয়েছি। কিন্তু এই ট্রেইলটা সত্যিই আমাকে প্রায় ভর্তা বানিয়ে দিচ্ছিলো। ৬০-৭৫ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে। উপরের দিকে শুধু উঠছি তো উঠছিই! পথ যেনো আর শেষই হয় না! থেমে যে। একটু বিশ্রাম নিবো সেই উপায়ও নেই। একেতো জোকের ভয়, তার উপরে ঝাকে ঝাকে পাহাড়ি মশা। আমাদের গ্রুপে অনেকেই জীবনে প্রথমবারের মতো এমন। কোনো ট্রেইলে এসেছিলো। তাদের প্রত্যেকের অবস্থা ছিলো খুবই খারাপ। উঠছিলাম আর ভাবছিলাম এখানে বসবাস করা পাহাড়িদের কথা। কতটাই না কষ্ট করে তারা এখানে বসবাস করে!! অবশেষে একটা সময় এই ভয়ানক ট্রেইলও। শেষ হলো। আমরা ১০/১২ জন ট্রেইল ছাড়িয়ে লোকালয়ে এসে প্রায় ২০ মিনিটের মতো বিশ্রাম নিলাম।
তার পরের দিন আমাদের প্রধান সমন্বয়ক নির্বাচন অনুষ্টিত হয় এতে আমাদের। সাথে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় আর, জে, কিবরিয়া ও আয়মান।
সাদিক। সুন্দরভাবে সম্পন্ন হলো নির্বাচন, সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সবাই ব্যস্ত ছিলাম। তারপর আবার সন্ধায় বেড়িয়ে যাই আবার হ্যালীপ্যাডে ছবি উঠাতে।। সেখানে আমরা ৩ রাত ৪ দিন কাটাই। আর খাবারের কথা বলতে গেলে বাঁশের চা ও বাঁশের বিড়িয়ানি না খেলা অনেক মিস করবেন। বিদায় সাজেক, খাগড়াছড়ি, খুব দ্রুতই আবার আসবো ইনশাল্লাহ। সবার প্রতি অনুরোধ ০ঃ আমাদের দেশটা খুবই সুন্দর। দয়া করে কোথাও ঘুরতে গেলে পরিবেশটাকে ঠিক সেভাবেই রেখে আসুন যেভাবে আপনি নিজে দেখতে চান। হ্যাপি ট্রাভেলিং!

সাত রঙের চা

রাকিবুল ইসলাম ভূইয়া
সিভিল টেকনোলজি, ১ম শিফট, ১ম সেমিষ্টার

আমরা ক্লাস Six 'How to make a cup of tea? থেকে পড়ে আসছি। আজকে আমরা আবার চা বানানো শিখবো। তবে সেটা ৭ রঙের চা। সাত রঙের চা খেয়েছো, শ্রীমঙ্গল ৭ রঙের চা এর জন্য কিন্তু বিখ্যাত । আমরা কেউ যদি প্রথমবার সিলেট বিভাগে এসে থাকি তবে ৭ রঙের চা না খেলে মনটাকে কোনো ভাবেই শান্তনা দেওয়া যায় না। কিন্তু আজকে আমরা ৭ রঙের চা তৈরির পিছনে বিজ্ঞানটা কি তা জানব!

তার আগে ৭ রঙের চা সম্পর্কে আমাদের কিছু সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা দরকার, চলো জেনে নেই। এর উদ্ভাবক হচ্ছে 'রমেশ রাম গৌর'। আমাদের জন্য গৌরবের বিষয় হলো তিনি একজন বাংলাদেশি। আর একটি বিষয় যে, আমাদের মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল-এ এই চা পাওয়া যায়। এছাড়া সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় এই চা এখন পাওয়া যায়। তোমাকে যদি জিজ্ঞাস করা হয়, এভাবে চা-এর বিভিন্ন স্তর থৈরি করা হয় কীভাবে? তুমি হয়তো ভাববে তেল সদৃশ কিছু মেশানো হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে তেল পানিতে মিশে না বলে বিভিন্ন স্তর তৈরি হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এতে তেল বা অসাধারণ কিছুই মেশানো হয় না। এর প্রাথমিক উপাদান হলো পানি, চিনি, কন্টেন্ডস মিল্ক বা দুধ ও চা। আমরা হারহামেশাই এসব দিয়ে চা বানিয়ে থাকি। কিন্তু ৭ রঙ এর চায়ে কীভাবে এগুলো মিশানো হয় যে ৭টি আলাদা আলাদা স্তর বা লেয়ার তৈরি হয়। প্রথমে লক্ষ্য করি এর প্রস্তুত প্রণালীর দিকে। এর প্রস্তুত প্রদ্ধি-তে লুকিয়ে আছে গূঢ় রহস্য। প্রথমে চিনি দিয়ে সিরাপ তৈরি কাপে ঢালতে হয়, এর ৩০-৬০ সেকেন্ড পরে গরম দুধ ঢালতে হয়। এরপর একটার পর একটা ঢালতে হয়। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে প্রতিবার একটা উপাদান ঢালার পরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর আরেক উপাদান দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে নিচের লেয়ার অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা এবং যত উপরে যেতে থাকে তাপমাত্রা তত বাড়তে থাকে। আমরা জানি, তাপমাত্রা বাড়লে ঘনত্ব কমে এবং তাপমাত্রা কমলে ঘনত্ব বেশি হয়। ঘনত্ব কম হওয়ার ফলে সেটা উপরে ভেসে থাকবে। সে কারণেই স্তরগুলো এক সাথে মিশে যায় না। তবে এটাও পুরোপুরি সঠিক চিন্তা নয়। এর পেছনে লুকিয়ে আছে আরও মজার চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞান। তোমরা কী একটি বিষয় জানো, যে তাপ তিনটি পদ্ধতিতে সঞ্চালিত বা পরিবাহিত হয়। সেই পদ্ধতিগুলো হলো: পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ। তরল পদার্থ তাপ পরিচালিত হয়, পরিচলন পদ্ধতিতে কোন পাত্রের নিচে তাপ প্রয়োগ করতে থাকলে সেখানে থাকা তরল পদার্থের মধ্যে নিচের তরলটি আগে গরম হয়। ফলে ঘনত্ব কমে যায় এবং তা উপরের দিকে উঠে আসে, এবং অপেক্ষাকৃত ভারী বা গরম পদার্থটি নিচে চলে যায়। এভাবে তাপের আদান-প্রদান হয়ে থাকে। তবে ৭ রঙের চায়ের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গরম অংশ উপরের দিকেই থাকে। তাই যত উপর থেকে নিচের দিকে যাওয়া যায় তাপমাত্রা কমতে থাকায় পরিচলন বাধাগ্রস্থ হয়। এই কারণেই ৭ রঙের চায়ের স্তরগুলো একে অপরের সাথে মিশে যায় না। তবে চা ৭ রঙের বললেই আমরা যে ৭ রঙের চা তৈরি করছি তা নয়। তা ২ রঙের। চায়ের রঙ এবং দুধের ৭টি রঙ পেতে হলে লিকারের বদলে বিভিন্ন ফলের রস মিশিয়ে দিতে হয়। তবে এই ক্ষেত্রে চায়ের ৭টি রঙটি বা স্তরগুলো নির্ভর করবে ফলের রস এবং উপাদানের উপর।

–তাহলে, ঘরেই হয়ে যাক এক কাপ ৭ রঙের চা।

জ্ঞানই শক্তি

Knowledge is power

জান্নাতুল ফেরদৌস রাফি
পর্ব :৩/১, টেক : সিভিল, সেশন : ২০১৮-১৯

জার্মানির এক নামকরা ব্যাংকে ডাকাতির সময় ডাকাতে দলের সর্দার বন্দুক হাতে নিয়ে সবার উদ্দেশ্যে বললো," কেউ নড়াচড়া করবেন না, টাকা গেলে যাবে সরকারের, কিন্তু জীবন গেলে যাবে আপনার আর তাই তাই ভাবনা চিন্তা করে আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করুন"।

এই কথা শোনার পর, সবাই শান্ত হয়ে চুপচাপ মাথা নিচু করে শুয়ে পড়েছিল। এই ব্যাপারটাকে বলে "Mind changing concept ," অর্থাৎ মানুষের ব্রেইনকে আপনার সুবিধা অনুযায়ী অন্যদিকে কনভার্ট করে ফেলা।

সবাই যখন শুয়ে পড়েছিল, তখন এক সুন্দরী মহিলার কাপড় অসাবধনতা বসত তা পা থেকে কিছুটা উপরে উঠে গিয়েছিল এমন সময় ডাকাত দলের সর্দার তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো ' আপনার কাপর ঠিক করুন ! আমরা এখানে ব্যাংক ডাকাতি করতে এসেছি , রেপ করতে না।' এই ব্যাপারটাকে বলে "Being Professional". অর্থাৎ আপনি যেটা করতে এসেছেন, সেটাই করবেন। যতই প্রলোভন থাকুক অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়া যাবে না।

যখন ডাকাতরা ডাকাতি করে তাদের আস্তানায় ফিরে এলো তখন এক ছোট ডাকাত (এমবি এ পাশ করা) ডাকাত দলের সর্দার (যে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে) কে বললো, 'বস চলেন টাকাটা গুণে ফেলি'।

ডাকাত দলের সর্দার মুচকি হেসে বললো, তর কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা একটু পরে টিভি ছাড়লে নিউজ চ্যানেল গুলোই বলে দিবে আমারা কতো টাকা নিয়ে এসেছি।

এই ব্যাপারটাকে বলে 'Experience'। অভিজ্ঞতা যে গতানু-গতিক সার্টিফিকেট এর বাইরে গিয়েও কাজ করতে পারে, ইহা তার একটি উৎকৃষ্ঠ প্রমাণ।

ডাকাতরা চলে যাওয়ার সাথে সাথেই ব্যাংক এর এক কর্মচারী ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে ছুটে এসে বললো, স্যার তাড়াতাড়ি চলেন পুলিশকে ফোন করি, এখনই ফোন করলে, ওরা বেশি দূর যেতে পারবে না। ব্যাংক ম্যানেজার কর্মচারীকে থামিয়ে দিয়ে বললো, ওদেরকে আমাদের সুবিধার জন্যই এই ২০ মিলিয়ন টাকা নিয়ে যেতে দেওয়া উচিৎ, তাইলে আমরা যে ৭০ মিলিয়ন টাকার গরমিল করেছি, তা এই ডাকাতির ভিতর দিয়েই চালিয়ে দেওয়া যাবে।

এই ব্যাপারটাকে বলে," Swim with the tide," অর্থাৎ নিজের বিপদকে ও বুদ্ধি দিয়ে নিজের সুবিধা হিসেবে ব্যবহার করা।

কিছু সময় পরেই, টিভিতে রিপোর্ট আসলো, ব্যাংক ডাকাতিতে ১০০ মিলিয়ন টাকা লোপাট্ ডাকাতরা সেই রিপোর্ট দেখে বারবার টাকা গুনে ২০ মিলিয়ন এর বেশি বাড়াতে পারলো না। ডাকাত দলের সর্দার রাগে ক্রুদ্ধ হয়ে বললো , ' শালা আমরা আমাদের জীবনের ঝুকি নিয়ে এতো কিছু ম্যানেজ করে মাত্র ২০ মিলিয়ন টাকা নিলাম আর ব্যাংক ম্যানেজার শুধুমাত্র এক কলমের খোচাঁতেই ৮০ মিলিয়ন টাকা সরিয়ে দিল। শালা চোর-ডাকাত না হয়ে পড়াশুনা করলেই তো বেশি লাভ হত'।

এই ব্যাপারটাকে বলে " knowledge is worth us much as good !" অর্থাৎ অসির চেয়ে মসি বড়।

ব্যাংক ম্যানেজার মন খুলে হাসছে, কেননা তার লাভ ৮০ মিলিয়ন টাকা। ৭০ মিলিয়ন টাকার গরমিল করেও সে আরও ১০ মিলিয়ন টাকা এই সুযোগে তার পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে।

এই ব্যাপারটাকে বলে,

" Seizing the opportunity.'Daring to take risks !"

অর্থাৎ সুযোগ থাকলে তাকে কাজে লাগানোই উচিৎ....!'

আমার জীবনে বাবার মৃত্যুর একান্ত অনুভূতি

রোমানুর রহমান রোমান

টেকনোলজী : এই.আই.ভি.টি, রোল: ৩০, পর্ব : ১, শিফট : ০১

সবসময় একটা গাছ ছায়া দিত রোদের বেলায়। বৃষ্টির সময় রক্ষাদিত ছাতার মতো। রাতের বেলায় আকাশের তারা গুনতাম সেই গাছের ছায়ায় বসে। হঠাৎ ঝরে সেই গাছটা উদাও হওয়ার আগে বুঝতে পারিনি। গাছটার কতোটুকু মূল্য ছিল। আজ বুজি তার মর্ম কী ?

আরে আমি গাছটাকে একটা মানুষ দ্বারা বোঝাতে চেয়েছি। সেই মানুষটা আর কেও নয় সেটা হচ্ছে আমার বাবা। 'বাবা' এই চরিত্রটা একটু অন্যরকম। কখনো কাছে থেকে এর মূল্য বোঝা যায় না। কিন্তু দূওে গেলে বুঝতে পারা যায় বাবা নামক এই মানুষটি আমার কতটুক আপন ছিল। প্রত্যেক বাবার কাছে তার ছেলে রাজপুত্র ও রাজকন্যার মত হয়। এই বাবা আমার জন্য কতটুক ছাড় দিতো সেটা বাবাকে হারানোর আগে বুজতাম না।

জানেন আমার মা সারাদিন বকাবকি করত কিন্তু সে সময়টাতে আমার আশ্রয়স্থল হতো বাবা। মা যতোই বকাবকি করত সেটা বাবা কোল পর্যন্ত পৌছাত না। তাই মায়ের বকা শোনার পর বাবার কোলে পেতাম শান্তনার আশ্রয়। তবে বাবাও রাগত কিন্তু সেসময় মায়ের কোলেও নিস্তার পেতাম না।

মানুষের মুখে একটা কথা শুনা যায় একটা মেয়ে তখনই মা হয় যখন সে জানতে পারে সে মা হতে চলেছে। আর একটা ছেলে তখনই বাবা হয় যখন সে তার নিজের সন্তানকে কোলে নিয়ে দুখ চোখ ভরে দেখতে পারে।

পৃথিবীর সব বাবারই নাকী এই রকম হয় শুনেছি ? বাবা সন্তানের কাছে থাকে না। তার বিভিন্ন কাজে বাহিরে থাকে বা ব্যস্ত থাকে সন্তানের সন্তানের খোজ নেয়া কষ্ঠকর হয়। কিন্তু আমার বাবা একটু ব্যাতিক্রম ছিল । তিনি ছিলেন একজন কৃষক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান্ তার ছিল না পড়ালেখা কিন্তু কোন সময় বুঝতে দিত না তার মূর্খতা। বাবা হিসেবে তিনি আমাকে যেমন শাসন করত ঠিক তেমনি উৎসাহে ভরে দিত। বাবা সবসময় ছিল একজন প্রহরির মতো দিনরাত পরিশ্রম করে তার সন্তানের মুখে হাঁসি ফুটাবে। হয়ত অর্থের অভাবে ঠিকমতো পারেনি সকল চাহিদা মিটাতে কিন্তু কোনদিন যদি কিছু আবদার করতাম তাহলে অছির হয়ে যেত সে আবদার পূরণ করার জন্য। আমি যখন কোন একটা ভালো কাজ করতাম তখন বলত এই আমার ছেলে। তখন বাবার মুখের দিকে চেয়ে দেখতাম বাবার মুখ আনন্দে ভরে গেছে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় কি জানেন যখন আমি ক্লাসে ভালো নাম্বার পেতাম তখন বাবা আনন্দে উচ্ছাসিত হয়ে সারা এলাকা সুনাম কওে বেড়াতো ছেলের। আমি যখন ঢ়.ং.প পাশ করি তখন আমার

বাবা আমাকে পড়ানোর চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছেলেকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। আমি আমার বাবার কাছে আবদার করি বাবা আমি বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। তখন বাবার মুখে আমার এই কথা শুনে হাসিতে ভরে ওঠে। কিন্তু সেই হাসির মাঝে লুকিয়াছিল অনেক ব্যস্ততা কী করে ছেলের এই আবদার পূরন করবে, তখন আমার বাবা আমাকে বলে আমি যদি বেচে থাকি তাহলে আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও ছেলেকে মানুষ করব। কিন্তু সেই বাবা আজ হারিয়ে গেছে। ঠিক সেই গাছটার মতো। আজ বুঝি এই বাবা আমার কতটা ছিল। আজও মনে পড়ে আমার বাবার সাথে বলা শেষ বারের কথা। মোবাইলে কল দিয়ে বলেছিলাম 'আসসা-লামু আলাইকুম' আব্বু কেমন আছো ? আমি জানি তো বাবা অসুস্থ। হাসপাতালে থাকলে কোন লোক কী সুস্থ থাকে। আমার বাবা ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত আমার বাবা দীর্ঘ নয় মাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকার পর আবার সেই বাবার মাথায় ব্রেন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। কিন্তু জানেন সেই অসুস্থ বাবা আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়–

বাবা : ভালো আছি। তুমি কেমন আছ ?

আমি : ভালো আছি।

বাবা : খেয়েছ তুমি।

আমি : হ্যা খেয়েছি।

সেই বাবা আমাকে বলে আজকে আমার মাথার অপারেশন হবে। আমার জন্য দোয়া করো। আমার বাবার সাথে আমার ছোট আপু অঞ্জনা, আম্মু আমার চাচাত ভাই ও আমার তিন কাকা উপস্থিত ছিল সেদিন হাসপাতালে। আমার বাবাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায়।

বিকেল ৪টার সময়। বাড়িতে আমি আর আমার দুই বোন ছিলাম আমার বাবার অপারেশনের কথা শুনে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে লাগলাম। সময়টা ছিল রমজান মাস রোজা রেখে ছিলাম আমরা সবাই। দীর্ঘ ৪ ঘন্টা অপারেশন থিয়েটারে রাখার পর আমার বাবা জীবিত দেহকে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু বের করে নিয়ে এসেছিল একটা মরা লাশ। তখন প্রায় ৮.৩০ মিনিট বাজে। আমি মসজিতে নামাজ পড়তেছি ঠিক তখন আমার কাকার ফোনে কল আসছে তখনই আমার শরীরটা কেমন যেন অস্থির হয়ে গেল।আমার কেন জানিনা মনে হচ্ছিল আমি কোন একটা খারাপ খবর শুনতে চলেছি। নামাজ শেষ করে যখন কাকা ফোনটা ধরল তখন বলল যে সালামভাই আর নেই(আমার বাবার নাম ছিল সালাম) শুনার পর আমি আর কোন কথা বলতে পারছিলাম না। নড়তেও পারছিলাম না। তারপর কিছুক্ষন পর আমার কাকা হাত দিয়ে স্পর্শ করল তখন আমি অজ্ঞান হয়ে পরে যাই মাটিতে। তারপর যখন আমার জ্ঞান ফিরে আসে তখন আমার বাবাকে ঢাকা থেকে বাড়িতে আনা হচ্ছিল। তখন যেন আমার মুখ থেকে কান্না কেমন হাড়িয়ে গেছে। যখন এম্বুল্যান্স আমাদের বাড়িতে পৌছাঁয় তখন আমার বাবার সেই চাঁদমাখা মুখটি দেখে আমার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু পারিনি আমি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তারপর আমাকে হাসপাতাল নিয়ে যাচ্ছিল তখন অর্ধেক রাস্তায় আমার জ্ঞান ফিরে আসে। তখন তবুও আমার কাকা আমাকে হাসপাতাল নিয়ে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু কোনো সন্তান পিতার লাশ রেখে হাসপাতালে শুয়ে থাকতে পারে না। আমি জোর করে গাড়ি নিয়ে বাড়িতে চলে আসলাম তারপর বাবার লাশ দাফন করা হয়। সেদিন ছিল ২০১৮ সালের ২৬ জুলাই। সেদিন ছিল আমার দেখা শেষ বারের মতো।আমার বাবার মুখ আজও খুব মনে পরে। বাবাকে একবার দেখতে পারতাম। আজও খুজে বেড়ায় মাঝে মাঝে দূর আকাশের জ্বল জ্বল করা সেই তারা গুলোর মাঝে। হয়ত একদিন খুজে পাব তাকে আমাকে দেখে যে হাসছে আর আমার জন্য দোয়া করছে।

জানেন আমার বাবার স্বপ্ন ছিল আমি একদিন আমি ইঞ্জিনিয়ার হব। আজ আমি সেই পথে পা রেখেছি। কিন্তু সেই ব্যাক্তিটি সেটা দেখতে পারছে না। হয়ত দুরে বসেই আমার জন্য দোয়া করছে।

ভালো থাকুক পৃথিবীর সকল বাবারা। এপাওে অথবা ওপারে ।

আমার বাবা ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা।

আতঙ্ক গল্প

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান
আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন
টেকনোলজি : (এ.আই.ডি.টি), সেমিষ্টার : ৩য় পর্ব, শিফট : ১ম

আমি হাবীব। মা বলেন আমি নাকি বছর ছয় আগে তাদের ঘর আলো করে এসেছি। আচ্ছা আমি তো বাল্ব না যে আলো দেবো। আর আমার আসার আগে কি ঘরে বাল্ব ছিলো না। আচ্ছা তা থাকগে। এখন রোজা। 'ক' দিন পরেই ঈদ। ঈদ মানেই আনন্দ কিন্তু আমার কাছেই আতঙ্ক। কারন, গত বছর ঈদে এক ভয়াবহ ঘটনা হয়েছে। ঘটনা হলো, যে বছর ঈদের নামায পড়ে আব্বু আম্মুর সাথে এক আঙ্কেল এর বাসায় বেড়াতে গেলাম। বাসায় গিয়ে নক করার পর এক আন্টি দরজা খুললেন। খুলেই আন্টি তার কোলে আমাকে নিলেন। নিয়ে শুরু হলো অত্যাচার। আমার গাল টিপতে টিপতে ভর্তা বানিয়ে দিলেন। গালটি আমার লাল হয়ে গেল। তারপরও থামছে না। দেখলাম যে তারপর একটা বড় মেয়েও আছে। সে আমাকে নিয়ে যে কী শুরু করল। একবার কোলো নিয়ে এদিকে যায় আরেক বার কাঁধে নিয়ে ওদিকে যায়। কী যন্ত্রণারে বাবা ? এরপর শুরু হলো যাওয়ার পালা। আমি তো ছোট, তাই অল্প খেলেই হয়। না, শুরু করলো আরেক অত্যাচার। ঠেসেঠুসে খাওয়াচ্ছে। সেমাই দিলো এক বাটি। তারপর ফিরসি, এরপর পিঠা, এরপর আবার দই,এরপর ভাত-মাংস। আমি কি এত খেতে পারি ? কিন্তু তারা মানবেই না। খাওয়াচ্ছে তো খাওয়াচ্ছে। থামার কোনো নামগন্ধ নাই। আর এ দিকে আমার তো অন্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। টয়রেটে যেতে হবে ? কিন্তু বুঝতেই চায় না। তাই যা হওয়ার তাই হলো। কিছুক্ষন পর আম্মু জিজ্ঞেস করল, তোমার প্যান্টের পেছনে ভেজা কেন ? আমি প্রায় কেদেঁই বললাম, আম্মু আমি আর পারছি না। সব বেড়িয়ে যাচ্ছে। আর তাই এবার আমি আতঙ্কে আছি।

মন নয় হৃদয় মুগ্ধকর রাত

মোছা: শারমিন আক্তার
টেকনোলজি : AIDT, পর্ব : ০১

শীতের অন্তিম বিদায়ে বসন্তের আগমন। আজ হতে গত ছয়দিন পূর্বেই নবরূপে বসন্তকে স্থান দিয়েছি। আমাদের সুন্দরি রূপসীর বুকে। বসন্ত কুমারী স্থান পেতে না পেতেই প্রকৃতির যেন অবিরল সংস্কার হল। শুরু হল এই কৃষ্ণরঙ্গিন পাখির সবুজ শ্যামল প্রকৃতির প্রতি নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করা। নব-নবীন যেমন করে তাদের নিজেকে এর সৌন্দর্যের সাথে জড়িয়ে রাখে। ঠিক তেমনি প্রাকৃতিক সৃষ্ট প্রতিটি উপাধানের স্নিগ্ধতা ও কোমলতার কাছ থেকে কেউ বিতারিত নয়। বায়ু একটি উপাধান যার কবলে পড়ে মনের ভাষা, হাতে লেখা প্রতিটি অক্ষর উজ্জলিত হয়ে যায়। আজ প্রতিটি মূহূর্ত মনে হচ্ছে বাতাসের ঝংকারে গিরি-হিমালয় ছুটে আসছে আমার স্ব-নিকটে। চারদিকে অদৃশ্য বায়ু যে কলতান শব্দ তুলেছে তা যেন মন ফেরিয়ে হৃদয় ছুয়ে যায়। আজ অনন্ত তৃপ্তিময়ী হৃদয় থেকে মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া শব্দটি বার বার উল্লাসিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি ধন্য চিরধন্য জন্মেছি রূপসির উদরে। অবশেষে কুসুম কোমল বায়ুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার কোমলতা ও উদারতার জন্য। সে যে নি:স্বার্থভাবে প্রতিটি নবীনকে জাগ্রত করেছে তার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে নতুন পথ শিখতে। আমি মনে করি একমাত্র এই দোলানো বায়ুই পারে তার সঙ্গ করে প্রত্যেক নবীনকে সঠিক প্রান্তে পৌঁছে দিতে।

ছেলেধরা রহস্য

জেরিন খান
পর্ব : ৩/১,টেক : সিভিল,সেশন : ২০১৮-১৯

রিফাত ও লাব্বি দুই বন্ধু। ওরা শুধু বন্ধুই নয় খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু। দুই পরিবারের মধ্যেও অনেক মিল। শীতের ছুটিতে রিফাত গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। এইদিকে লাবিরের সময় কিছুতেই কাটতে চায় না। তার কিছুই ভাল লাগে না। সারাক্ষন মন খারাপ থাকে। লাবিরের এই অবস্থা দেখে তার পরিবারের লোকজনও দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। পরিবারের লোকজন বলতে লাবিরের মা-বাবা ও তার মামা। লাবিরের মামা গত কয়েক বছর ধরেই ওদের বাসায় থাকেন। উনি লাবিবকে খুবই জ্বালাতন করেন। শুধু যে জ্বালাতন করেন তাই নয়, তার বিরুদ্ধে অনেক কটু কথা বানিয়ে বানিয়ে ওর মা–বাবাকে বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। এইজন্যই পল্টু মামাকে অসহ্য লাগে লাবিবের।

বিকেলবেলা লাবিব বিছানায় শুয়ে আছে। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসছে না। এই সময় দরজায় কলিংবেলের শব্দ শুনতে পেল। বিরক্তি নিয়ে দরজা খুলতেই দেখে ডাকপিয়ন ওর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছেন। উনি লাবিবের দিকে একটি চিঠি বাড়িয়ে দিলেন। দ্রুত চিঠিটা হাতে নিয়ে ও দেখে নিল চিঠিটা কোন দেশ থেকে পাঠানো হয়েছে। কারন ওর ফুফাত ভাই মাঝে মাঝে কুয়েত থেকে চিঠি পাঠায়। কিন্তু চিঠিটা বাংলাদেশেরই কেউ পাঠিয়েছে। খামের উপরের নাম দেখে লাবিব আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। ডাকপিয়নকে বিদায় দিয়ে ও দ্রুত ড্রইংরুমে আসতে আসতে খামের ভেতর থেকে চিঠিটা বের করতে লাগল। চিঠিতে কী লিখা আছে তা পড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল। আগ্রহ নিয়ে লাবিব চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

প্রিয় লাবিব,

কেমন আছিস ? আমাকে ছাড়া হয়তো তোর খারাপ লাগছে। সত্যি আমার ঠিক একই অবস্থা সময় যেন কাটতে চায় না। আমি সবসময় তোকে আমার পাশে অনুভব করি। কিন্তু এভাবে আর থাকতে পারছি না। তুই আন্টি–আঙ্কেলকে বলে তাড়াতাড়ি আমাদের গ্রামের বাড়িতে চলে আয়। তুই কল্পনাও করতে পারবি না। আমাদের এই গ্রাম কত সুন্দর আর কত ঐতিহ্য নিয়ে দাড়িঁয়ে আছে । তুই আসার পর তোকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাব। দেরি করবি না কিন্তু। পরশু বাসে করেই চলে আসবি। এখানে যেন রহস্যেও গন্ধ পাচ্ছি। তুই তাড়াতাড়ি চলে আসবি।

আন্টি–আঙ্কেলকে আমার সালাম জানাবি।

ইতি

তোর বন্ধু রিফাত

চিঠি পড়ে যতটা না আনন্দ হল তার চাইতে বেশি চিন্তায় পড়তে হল লাবিবকে। ভয়টা হল বাবা তাকে এভাবে একা অচেনা জায়গায় যেতে দেবেন কিনা। তাছাড়া এই কথা শোনার সাথে সাথেই পল্টু মামা অনেকগুলো কথা মা–বাবাকে শুনিয়ে দেবেন হয়তো। তখন যাওয়ার আনন্দটাই বৃথা হবে। হাতেও আর সময় নেই। মধ্যে আর মাত্র একদিন। এই একদিনের মধ্যে যা করার করতে হবে। যেমন করেই হোক আনন্দপুর গ্রামের রহস্যভেদ করার জন্য যেতেই হবে। সন্ধ্যার দিকে লাবিব চুপিচুপি ওর মায়ের কাছে গিয়ে বসল। মায়ের কাছে জানতে পারল মামা কিছুক্ষন আগে তার এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন। দুই তিন থেকে আসবেন। সংবাদটা শুনে লাবিব কিছুটা শান্তি পেল। গল্পের ফাঁকে লাবিব রিফাতের লিখা চিঠিটা মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মাকে পড়ত বলল। পড়া শেষ হবার আগেই লাবিব মাকে বলল 'প্লিজ মা না করো না। আর রিফাতের মা–বাবাও সেখানে আছেন। কিছুদিন থেকেই আমি চলে আসব।'

মা বললেন-' আচ্ছা তোর বাবাকে বলে দেখব উনি কী বলেন। আমার একার সিদ্ধান্তে তো যেতে পারবি না। এখন পড়তে বসো গিয়ে।'

এক দৌড়ে লাবিব নিজের রুমে আসল। রুমে এসেই দরজা বন্ধ করে লাফাতে লাগল। মায়ের কথায় বোঝা গেল মা রাজি। আর মা যদি একবার বাবাকে রিকুয়েস্ট করেন তাহলে বাবা নিশ্চয়ই রাজি হবেন। লাবিব তার ব্যাগ গুছাতে লাগল। সাথে একটি খাতা,কলম ও তার দূরবীক্ষণ যন্ত্রটাও নিল। মা সকালে জানিয়ে দিলেন বাবা রাজি হয়েছেন। পরদিন সকালে লাবিব মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্টেশন গিয়ে আনন্দপুরের বাসে উঠল। বাস থেকে নামতেই রিফাত ওকে জড়িয়ে ধরল। একটি হোটেলে দুজন মিলে

কিছু খাবার কিনে খেল। খাবার শেষ করে ওরা রিক্সা করে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে পৌছল। উঠোনে নামতেই রিফাতের দাদু বললেন, 'এই সময়ে না আসলেই ভাল করতে। কিন্তু এসেই যখন গেছ দাদাভাই তবে সাবধানে থেক। কেউ ডাকলে বা অপরিচিত কেউ কিছু দিলে নিও না।' আসার সাথে সাথেই এই কথা শুনে লাবিবের মন খারাপ হয়ে গেল। রিফাত ওকে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে ওরা দুপুরের খাবার সেরে নিল। খেতে খেতে রিফাতের মায়ের সাথে গল্পও করল ওরা। খাবার শেষ হতে না হতেই রিফাত ও লাবিব বেরিয়ে পড়ল গ্রামের রাস্তা দিয়ে। লাবিবের হাতে ওর দূরবীক্ষন যন্ত্রটা। যেতে যেতে লাবিব রহস্য নিয়ে জানতে চাইল। রিফাত বলল, কিছুদিন ধরে ওদের বয়সি ছেলেদের কে বা কারা যেন ধরে নিয়ে যায়। কেউ তার কোনো হদিস পায় না। এই নিয়ে দুই গোয়েন্দা ভাবতে লাগল। কখন যে ওরা জঙ্গলের ভেতর চলে আসল তা টেরই পেল না। হঠাৎ একজন মানুষের চিৎকার শুনে ওরা গাছের আঁড়ালে লুকিয়ে পড়ল। লাবিবের কাছ থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা নিয়ে রিফাত রাজবাড়ির দিকে কী যেন দেখতে লাগল। তারপর ওরা আস্তে আস্তে রাজবাড়ির দিকে এগোতে লাগল। সেখানে গিয়ে তারা যা দেখল তাতে একটুও প্রস্তুত ছিল না ওরা। তারা দরজায় একটি ছিদ্র দিয়ে দেখতে পেল ভেতরে তিনজন মধ্যবয়স্ক লোক ও ছয়-সাতটি ছেলে হাত পা ও মুখ বাধা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। রিফাত-লাবিব নিজেদের মধ্যে কী যেন কথা বলাবলি করছিল আস্তে আস্তে। হঠাৎ দরজায় ছিদ্র দিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল একজন লোক দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। তারা কী করবে বুঝতে না পেরে দৌড় দিল। যাতে লোকটি এসে দরজা দরজা খোলার আগেই ওরা গাছের আঁড়ালে লুকিয়ে যেতে পারে। কিন্তু হায় ভাগ্য দৌড় দিতে গিয়ে পাথরে পা লেগে সেখানেই পড়ে যায় রিফাত। লাবিব কিছু করার আগেই লোকটি রিফাতকে ধরে রুমের ভেতরে নিয়ে যায়। লাবিব সুযোগ বুঝে পেছন দিকে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে সব শুনতে লাগল। ভাগ্য ভাল। লোকগুলো ভেবেছে রিফাত ওদেরই ধরে আনা কোনো ছেলে। ভয়ে পালিয়ে যেতে গিয়ে ধরা পড়েছে। লাবিব বুঝে গেল যে এই লোকগুলো ছেলেদের ধরে এনে বিদেশে পাচার করে দেয়। এখানে আর দাঁড়িয়ে না থেকে লাবিব বাড়ির দিকে দৌড় দিল। চোখে-মুখে তার বিস্ময়। এত তাড়াতাড়ি ছেলেধরা রহস্য উদঘাটন করতে পারবে এইটা কল্পনাও করে নি ও। বাড়িতে গিয়ে রিফাতের বাবাকে উঠোনেই পেয়ে গেল লাবিব। তাকে দূরে ডেকে এনে সব ঘটনা খুলে বলল ও। উনি থানায় ফোন করে সবকিছু জানিয়ে দিলেন। উনি লাবিবকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে এগোতে লাগলেন। তিন রাস্তার মোড়ে গিয়ে কিছুক্ষন অপেক্ষা করতেই তিনটি গাড়ি করে পুলিশ এসে পড়ল। গাড়িগুলো সেখানে রেখেই সবাই পায়ে হেঁটে এগোতে লাগল। কারন গাড়ির শব্দ শুনে হয়তো লোকগুলো সরে যেতে পারে। ওসি সাহেব পুলিশদেরকে বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে রাজবাড়ি ঘেরাও করতে পারবে ও কীভাবে লোকগুলোর উপর আক্রমন করে ছেলেদের বের করে আনতে হবে। কথামতো পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করে সবগুলো দরজা ভেঙ্গে ফেলল। কিন্তু কোথাও কোনো চিহ্ন নেই, কেউ নেই। বাড়ির সব জায়গা খুঁজেও কাউকে না পেয়ে যখন সবাই বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন লাবিব থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখতে লাগল মাটির দিকে তাকিয়ে। সাথে সাথে ওসি সাহেবের কানে কানে কী যেন বলল। উনি আস্তে করে তার হাতের রাইফেল দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন। তারপর যা বুঝার বুঝে গেলেন। তিনি সবাইকে নির্দেশ দিলেন। তাকে অনুসরণ করার জন্য। তিনি শক্ত একটি লোহার লাঠি দিয়ে মাটিতে তিনবার আঘাত করতেই নিচের দিকে একটি সুড়ঙ্গ দেখা গেল। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতেই মধ্যবয়স্ক লোক ও ছেলেদেরকে দেখতে পেলেন সবাই। রিফাত লাবিবকে দেখে আনন্দে চমকে উঠল। লোকগুলো কিছু করার আগেই পুলিশ তাদের হাতকড়া পরিয়ে দিল ও ছেলেদের বাধঁন খুলে দিল। লাবিব রিফাতকে জড়িয়ে ধরল। রিফাত বলল,' আর একটু পরে আসলেই আর কাউকে পাওয়া যেত না। সবাইকে নিয়ে লোকগুলো বিমানবন্দরে চলে যেত। বাইরে গাড়ির শব্দ শুনে লোকগুলো তাদেরকে ধরে এনে সুরঙ্গের ভেতরে রেখেছে।'

ওসি সাহেব বললেন,' সবই হয়েছে লাবিবের জন্য। ও যদি সুরঙ্গের কথা না বলত তাহলে আমরা কিছুই করতে পারতাম না। লাবিব রিফাতের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। কিছুক্ষন পর বলল,' আমরা যখন হাঁটতে আসি তখন রিফাত একমনে ভেবেই যাচ্ছিল। যখন দেখলাম ও রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে তখন আমি আমার কলম দিয়ে গাছে চিহ্ন দিয়ে রেখেছি। যাতে ফিরার সময় পথ না হারাই। আমি যদি এটা না করতাম তবে আমি বাড়ি পৌছতে পারতাম না। আঙ্কেলকে খবর দিতে পারতাম না। আর আপনারাও জানতেন না। উপস্থিত সবাই লাবিবের প্রশংসা করতে লাগল। ওসি সাহেব লাবিব ও রিফাতকে ধন্যাবাদ জানিয়ে লোকগুলোকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। আর রিফাত লাবিব ও রিফাতের বাবা বাজারের দিকে হাঁটতে লাগলেন। রিফাতের বাবা আজ স্পেশাল কিছু ওদেরকে খাওয়াবেন। যেতে যেতে লাবিব ভাবতে লাগল সবই তার মায়ের জন্য সম্ভব হয়েছে। মা আসতে না দিলে কিছুই সম্ভব হতো না।

অতি চালাকে গলায় দড়ি

মাসুদা আক্তার (শারমিন)
ডিপার্টমেন্ট : CMT ৩/১ (B)

এক দেশে একটি রাজার তিনটি মন্ত্রি ছিল। একদিন রাজা তাঁর তিন মন্ত্রিকে বলে পাঠালেন একসাথে ব্যাগভর্তি করে তাঁর জন্য ফল আনার জন্য। এবার তিন মন্ত্রি বনের তিনদিকে গেলেন ফল আহোরন করার জন্য.....

প্রথম মন্ত্রি : রাজা যখন বলেছে, ভালো ভালো ফল তার জন্য নিতে তাহলে সুস্বাদু ও ভালো ফল নিয়ে যাওয়া উচিত। রাজা ব্যাগ খুলে দেখবে বা না দেখবে সেটা তার ব্যাপার। আমি ভালো ফলগুলো দিয়েই ব্যাগভর্তি করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রি : সে বলে রাজা বলেছে, ফল নিয়ে যাওয়ার জন্য সে কি আর পুরো ব্যাগ খুলে দেখবে কিরকম ফল আছে তার এত সময় আছে না কি। তার থেকে ভালো এত কষ্ট না করে নিচে খারাপ ফল রেখে উপরে কয়েকটা ভালো ফল দিয়ে ব্যাগভর্তি করে নিয়ে যাই রাজা কিছু বুঝবে না।

তৃতীয় মন্ত্রি : তার ভাবনাটা ও দ্বিতীয় মন্ত্রির মতো ছিল। সে ভাবলো রাজাত ব্যাগ খুলে দেখবেই না তাহলে ব্যাগে যা ইচ্ছে তাই নিয়ে যাই। সে ব্যাগভর্তি করল ময়লা কাগজপত্র, লাটি এগুলো দিয়ে কোনো ফলই নাই।

তারপর তিন মন্ত্রি তিনটি ব্যাগ নিয়ে রাজার সামনে উপস্থিত হল। রাজা দেখে খুবই খুশি হলেন। দ্বিতীয় দুই মন্ত্রির ভাবনার মতোই রাজা ব্যাগ খুলে দেখলেন না। তারাও খুব খুশি। রাজা হঠাৎ করে তার সেনাপতিকে বললেন, তিন মন্ত্রিকে তিন কারাগারে বন্দি কর এবং ১০ দিন কোনো খাবার দেবে না তাদের কাছে যা ফল আছে তা দিয়ে ১০ দিন কাটাবে। এবার ত দুই মন্ত্রি খুবই অবাক হলেন এবং চিন্তিত হয়ে পড়লেন। প্রথম মন্ত্রির কাছে ত ব্যাগভর্তি ভালো ভালো ফল আছে সে ১০ দিন কারাগারে নেচে গেয়ে খেয়ে কাটিয়ে দিলো। দ্বিতীয় মন্ত্রি নিজের ভুলের কারনে ৪-৫ দিন কিছু ফল খায় যা ছিল তার কাছে পরে আর খেতে না পেয়ে মারা যায়। তৃতীয় মন্ত্রির কাছেত কিছুই ছিল না। চালাকির কারনে না খেতে পেয়ে ২ দিনের মাতাই মারা যায়। আসলে সেটা ছিল রাজার একটি পরীক্ষা তিনমন্ত্রির মধ্যে কে ভালো আর কে লোভী, স্বার্থপর আর তাঁর সাথে বেইমানি করে সেটা দেখতে চেয়েছেন। অবাকভাবে রাজা ১০ দিন পর দেখলেন, প্রথম মন্ত্রি ছাড়া বাকি দুই মন্ত্রি মারা গেছে। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁরা রাজার সাথে আড়ালে বেঈমানি করে এবং লোভী ও স্বার্থপর।

কাজেই ভালো ভাবে চললে ভালো ফল পাওয়া যায় আর খারাপ মানুষের জন্য খারাপ টাই থাকে।

সুতরাং,

উপরের গল্প থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়, সবসময় ভালো ভাবে সৎ পথে চলা উচিৎ। কারো পিছনে বা আড়ালে তার সাথে বেঈমানি করা উচিত নয়। বেঈমানি করলে কোনো একদিন সেটার শিকার সেই হবে।

ছোট গল্প

"আয়না ঘর"

রুপকথার এক গ্রামের নদীর ধারে একটি ঘর যার নাম ছিল ' এক হাজার আয়না ঘর ' । সেই গ্রামে সুন্দর হাসি মাখা মুখের একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল। মেয়েটি একদিন তার বাবা-মা'র মুখে শুনতে পায়, তাদের গ্রামের ' আয়না ঘর ' এর কথা। এর আগে মেয়েটি কোনো দিন ঘর থেকে বের হয় নি। সে প্রকৃতি দেখে নি, দেখেনি কোনও বাস্তবতা। তো সে একদিন চিন্তা করলো যে, সে ওই আয়নার ঘর দেখতে যাবে। কিন্তু একা একা যেতে সাহস না হওয়াই সে তার সমবয়সি আরেকটি মেয়েকে সাথে করে নিয়ে গেলো। আয়নার ঘরের সামনে হাজির হয়ে প্রথম মেয়েটি ভাবলো যে আগে সে ঐ ঘরে ঢুকবে আর সব কিছু দেখে এসে বাইরে এলে তবেই দ্বিতীয় মেয়েটি ঢুকবে।.....

কথামতো ১ম মেয়েটি ঐ ঘরের ভিতর ঢুকলো।.....

ঘরে ঢোকার সাথে সাথে আশ্চর্য সব রঙ্গিন কারুকার্য দেখে মেয়েটির মুখ আনন্দে ভরে উঠলো। সে আস্তে আস্তে এগোতে এগোতে সেই এক হাজার আয়নার ঘরে প্রবেশ করলো। ঘরে ঢুকেই তার চোখ ছানাবড়া। মেয়েটি দেখল সেখানে ঠিক তারই মতো দেখতে আরও এক হাজার মেয়ে হাস্যোজ্জল মুখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে যা করছে বাকিরাও ঠিক তাই তাই করছে। মেয়েটি এবারে সব কিছু দেখে অনেক মজা পেয়ে বাইরে চলে এলো এবং তার সাথীকে সব ব্যাপারে খুলে বলল এবং বলল যে, " এমন সুন্দর জায়গা আমি আগে কখনো দেখিনি। সুযোগ পেলেই এবার থেকে আমি এই জায়গায় চলে আসবো।" সব কথা শুনে এবার ২য় মেয়েটি কিছুটা ভয় নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকলো। ঘুরতে ঘুরতে আতংকিত মনে সে ও আবার সেই " এক হাজার আয়নার " ঘরে প্রবেশ করলো। ঘরে ঢোকার সাথে সাথে মেয়েটি ভয় পেয়ে উঠলো। ভয়ে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, আতংকিত হয়ে উঠলো চোখ। সে খেয়াল করলো ঠিক তারই মতো দেখতে আরও এক হাজার মেয়ে আতংকিত ভয়ার্ত চোখ তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মেয়েটি যেই ভয়েতে দুই হাত তুলে বলছে তোমরা কারা ? সাথে সাথে বাকি এক হাজার মেয়েও দুই হাত তুলে ওর দিকে নজর দিচ্ছে। এবারে মেয়েটি ভয় পেয়ে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল এবং ১ম মেয়েটিকে বলল, "তাড়াতাড়ি বাড়ি চল, এটা খুব বাজে জায়গা। আমি আর কোনো দিন এই জায়গায় আসব না।"

শিক্ষা : জীবনটাও একটা আয়না স্বরূপ। আপনি যেভাবে জীবনকে দেখবেন, সেও ঠিক সে ভাবেই আপনার কাছে ধরা দিবে। যারা সাহসিকতা, ভালোবাসা, উৎসাহ, জয় করার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। জীবন তাদের কাছে অনেক সহজ ও আনন্দ ময় হয়ে ধরা দেয়। কিন্তু যারা, হতাশা, ভয়, মানসিক অবসাদ নিয়ে সামনে এগুতে চায়, তাদের চোখে সাফল্য যেন মরীচি-কা। জীবন হয়ে উঠে ক্লান্তিকর ও বিচন্নময়।

বাস্তবকে আপনি যেভাবে দেখবেন, আপনার সামনে তা সেভাবেই ধরা দিবে।

গোয়ালিনির স্বপ্ন

মো: শাকিবুল ইসলাম
টেকনোলজি : কম্পিউটার, পর্ব : ১ম, শিফট : ১,

ছোট্ট মিয়ে ইরানি তার ঠাকুরমার সঙ্গে ছোট্ট একটা গ্রামে বাস করত। ইরানি ছিল গোয়ালিনি আর ওদের কাছে দুটো গরু ছিল। রোজ সে গরুর দুধ ধুয়ে মাথায় করে সেই দুধের কলসি নিয়ে যেত কাছের এক শহরে। সারাদিন দুধ বিক্রয় করে সন্ধ্য বেলায় সে বাড়ি দিয়ে আসত। ইরানি তার গরুদের খুব যত্ন করত। তাদের ঠিক মত খেতে দিত আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখত। ঠাকুমা ইরানিকে খুব ভালবাসত। কিন্তু ইরানি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখত। সে স্বপ্ন দেখত যে বড় লোক হয়ে গেছে। আর দিবা স্বপ্নই তাকে সবসময় বিপদে ফেলত।

ঠাকুমা : ইরানি তুমি কি কর। গরু গুলোর উপর নজর রাখছ না কেন। ওরা গোয়াল থেকে বের হয়েগেল।

ইরানি : ওহ, ঠাকুমা স্বপ্ন দেখছিলাম। মানে হচ্ছে ভাবছিলাম।

ঠাকুমা : ওহ, ইরানি আমি জানি তুমি কী ভাবছিলে। সারাদিন বড় লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখ। তার জন্য আর পরিশ্রম করতে হবে, স্বপ্ন দেখলে শুধু বড় লোক হওয়া যায় না। এই দিবা স্বপ্নের জন্য তোমাকে অনেক বড় মূল্য তোকাতে হবে।

কিন্তু ইরানি তার কথা শুনত না দিবা স্বপ্ন দেখা ইরানির বন্ধ হলো না। একদিন সে দুধ বিক্রি করতে যখন বেড়বে তখন তার ঠাকুমা তাকে রান্না ঘরে ডাকল।

ঠাকুমা : শোন আমার বাছা, ইরানি আজ তোমাকে বাজারে দুধ বিক্রয় করতে যেতে হবে না।

ইরানি : কেন যেতে হবে না ঠাকুমা।

ঠাকুমা : আমাদের পাশের গ্রামে কাল একটা বিরাট বিয়ের অনুষ্ঠান রয়েছে পঞ্চায়ত প্রধান তার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। আসপাশের সব মান্য-গন্য লোকেরা সেই বিয়েতে আসবে। বিরাট হবে এই বিয়ের অনুষ্ঠান। তুমি কিছু বুঝলে আমি কী বল্লাম আমরা সবাই যাব এই বিয়েতে। বুঝতে পারলে কী আমার কথা।

ইরানি : বিয়ে হচ্ছে, তার মানে তো বিরাট বড় ব্যাপার। বড়লোকেরা সব আসবে। কিন্তু ঠাকুমা দুধ কেন বিক্রয় করব না পঞ্চায়েত প্রধান রেগে যাবে।

ঠাকুমা : একটু হেসে বলল, "ওহ,হা,হা,হা"। না আমার মিষ্টি মেয়ে পঞ্চায়েত প্রধান তার রাধুনিকে বলেছেন যে, নানা ধরনের সুস্বাদু মিষ্ঠি বানাতে রাধুনি নিজে আমায় বলেছেন আমরা যেন সেই রাধুনিকে এক কলসি তাজা দুধ পাঠিয়ে দেই। সেই দুধ দিয়ে সুস্বাদু মিষ্ঠি বানাবে। আর সে আমাকে একথা ও বলেছে যে বাজারের থেকে দ্বিগুন দাম দিয়ে সে আমাকে এই দুধের জন্য। । এই জন্য কাল গোয়ালের দুধ নিয়ে যেতে হবে ঐ পঞ্চায়েতের বাড়ি।

ইরানি : দ্বিগুন টাকা দিবে আমি কি কাল ঐ বিয়ে বাড়িতে যেতে পারি। যে, আমি দেখব যে যাতে সবাই জানতে পারে যে মিষ্টি গুলো আমাদের গরুর দুধ দিয়ে বানানো হয়েছে তখন প্রধান তার অতিথিদির সাথে আলাপ করিয়ে দিবেন। ওহ আমি কি সুন্দর পোষাক পড়ে মাথা উঁচু করে হাটব যে, আমরা এত পরিশ্রম করে আমাদের সম্মান দেওয়া উচিত। সবাই আমার নাম জানবে।

ঠাকুমা : ওহ, মাটির কেল্লা বানিও না। আমাদের দুধ এখন সেই গ্রামে পৌছে নাই। আর এখনি স্বপ্ন দেখছ। তাদের ঐ মিষ্ঠি কত ভালো লাগবে। এই মেয়েকে নিয়ে আমি কি করি।

ইরানি : ভুল হয়ে গেছে ঠাকুমা। আমি দুধ নিয়ে ঐ গ্রামে যাব।

ঠাকুমা : এই যে নাও মনে থাকে যেন এক ফোটা দুধও যেন মাটিতে না পরে। বিনা কারনে তুমি থামবে না। সাবধানে যাবে।

ইরানি : চিন্তা করোনা ঠাকুমা। আমি খুব যত্ন করে এই কলসি আর দুধ নিয়ে যাব। তুমি দেখ আমরা কত তারাতারি প্রধানের চাইতে ও বড় লোক হয়ে যাব।

ঠাকুমা : মনে রেখো কিন্তু ঠাকুমা।

ইরানি : আমি জানি, আমি জানি, মাটির কেল্লা বানাবো না। গ্রামের রাস্তা ছিল নুড়ি পাথরে ভরনি। ইরানির ছাগল ছানা খুবই প্রিয় ছিল। কিন্তু তার হাটতে ভালো লাগতো না। কি সুন্দর এই ছাগল ছানাটা। ছানাটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে। থাকগে আমিত অনেক বড় লোক হয়ে যাব আর তখন আমি শহরে থাকব। আর শহরের মানুষ তো ছাগল ছানা আদর করেনা। ইরানি মনের সুখে গান গাইতে লাগল যে, "আমি বড় লোক হব"। আমি শহরে থাকব। আর ভাবতে লাগল যে আমি যখন অনেক বড়লোক হব তখন আমি ""সেনাবাহিনীর চাকরী ওলা ছেলেকে বিয়ে করব"" বলতে লাগল যে, তখন আমি সে সেনাবাহিনীর সঙ্গে বেড়াতে যাব আমার সব বান্ধবীরা আমাকে দেখে তাঁকিয়ে থাকবে। সে এই কথা ভাবতে ভাবতে সে যেন কল্পনার জগতে হারিয়ে গেল। তখন ইরানিক খেয়ালি ছিল না যে তার মাথা দুধের কলসি রয়েছে। সে হঠাৎ কাদাঁর রাস্তায় এক ছাগল ছানার সাথে ধাক্কা খেল। আর তখন তার মাথায় থেকে দুধের কলসি মাটিতে পরে ভেঙ্গে গেল। আর সম্পূর্ণ দুধ নষ্ট হয়ে গেল।

তখন ইরানির তার ঠাকুমার কথা মনে পড়ল যে, মাটির কেল্লা বানিও না দিবা স্বপ্ন দেখনা।

গল্প

এক পড়ন্ত বিকালে, ঝড়ে যাওয়া ফুল

আসিফ হোসেন অন্তর
টেকনোলজি : সিভিল ৭/২

ঢাকা সিলেটের ট্রেনে উঠেই দেখি আমার উল্টো দিবো এক অসুস্থ্য বৃদ্ধা মাথা নিচু করে বসে আছেন। টিকিট দেখাতে না পেরে ভদ্র-লোকের মুখে এতটাই অপরাধী ভাব যেনো এক খুনের মামলার আসামি। টিটির অকথ্য ভাষার গালাগালিতে আমি আর বসে থাকতে পারছিলাম না। [একট কর্কষ ভাষায় বললাম]

আমি : টিটি সাহেব ফাইনসহ কত ? আমি দেবো।

টিটি : আপনি দেবেন কেনো ?

আমি : তাতে আপনার কী ? টাকা নিয়ে রশিদ কেটে দিন। [রশিদটা বৃদ্ধার হাতে দিয়ে বললাম] চাচারশিদটা রাখুন পথে লাগতে পারে।

বৃদ্ধা : কাদঁতে কাঁদতে বৃদ্ধা বললো বাবা তুমি আমার মান সম্মান বাচাঁলে।

আমি : [পরিস্থিতি স্বাভাবিকের জন্য মৃদু হেঁসে বললাম] আপনি ঢাকায় কোথায় থাকেন ?

বৃদ্ধা : আমি গাজীপুর হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলাম।

আমি : শিক্ষক শুনেই আমি স্যারকে বলি আমাকে তুমি বারে বলবেন।

স্যার : বাইশ বছর পর স্যার শব্দটি শুনে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম নারে বাবা।

আমি : টিস্যু এগিয়ে দিয়ে বললাম স্যার আপনার গল্পটা যদি বলতেন।

স্যার : দুটো ছেলে, আর মেয়েটি জন্মের সময় ওদের মায়ের মৃত্যু হলো। সন্তানদের দিকে থাকিয়ে আর বিয়ে করলাম না। গাজীপুরেই মাথা গুঁজর ঠাঁই করি। সন্তানদের বাবা মায়ের আদর দিয়ে বড় করলাম। বড় ছেলেটা ডুয়েট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলো আর ছোট ছেলেটা ঢাকা মেডিক্যাল থেকে পাশ করলো।

আমি : মেয়েটিকে কি পড়ালেন ?

স্যার : নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষজনের ধারনা মেয়েকে লেখা পড়া শিখিয়ে লাভ কী ? পরের বাড়ি চলে যাবে। বরঞ্চ ছেলেকে সুশিক্ষিত করে তুললে বৃদ্ধা বয়সে একটু মাথা গুঁজার ঠাই হবে। আমরা খুব স্বার্থপর জাতির বাবা। মেয়েটি ইন্টারমিডিয়াট পাশ করার সাথে সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম। ছাত্রী ভালো ছিল।

আমি : তারপর ?

স্যার : ছেলে দুটোকে বিয়ে করালাম। ছেলে দুটোর অনুরোধে জমিটুকু বিক্রী করে বড় ছেলে পল্টনে আর ছোট ছেলে উত্তরায় ফ্ল্যাট কিনলো।

আমি : মেয়েকে কিছুই দেন নাই ?

স্যার : সেটাই একটা বিরাট ভুল। ছেলের বৌদির সিদ্ধান্তে প্রতি মাসের ১ হতে ১৫ বড় ছেলের বাসায় আর ১৫-৩০ ছোট ছেলের বাসা সুটক্যাস নিয়ে ছুটাছুটি। মেয়ে অবশ্য বহুবার বলেছে আব্বা আপনি আমার কাছে চলে আসেন। কোন মুখ নিয়ে যাবো ? কতদিন যাবৎ বুকের বাম দিকটা ব্যাথা করছে।

আমি : ডাক্তার দেখাননি ?

স্যার : (মৃদু হেঁসে) ডাক্তার আবার, ছোট বৌমাকে বললাম আর কয়েকটা দিন থাকি। সে সুটকেসটা বাহিরে ফেলে দিয়ে ইংরেজিতে বললো ংবব্ুড়ঁ হবীঃ সড়হঃয. বড় ছেলের বাসায় গিয়ে দেখি তালা মারা। দাড়োয়ান বললো ওরা দু'সপ্তাহের জন্য মালোশিয়া গেছে। তারা জানে নির্ধারিত সময়ানুযায়ী আমার আসার কথা। পকেটে বিষ কেনার পয়সাও নেই। তাই ভাবলাম মেয়েই শেষ অবলম্বন।

আমি : মেয়ে কি করে ?

স্যার : স্বামীটা খুব ভাল। ওকে শাহজালাল থেকে কম্পিউটার সায়েন্স এ পড়িয়ে ওরা দুজনই প্রাইভেট ব্যাংকে আছে।

আমি : আপনার মেয়ে কোথায় থাকে ?

স্যার : ব্রাহ্মনবাড়িয়া থাকে ?

আমি : আপনার মেয়ে যদি আপনাকে গ্রহন না করে।
স্যার : মেয়ে পায়ে ধরে কান্না করলে আমাকে তাড়িয়ে দেবে না।
আমি : এতো আত্মবিশ্বাস ? মেয়ে কি জানে আপনি আসছেন।
স্যার : না আমারতো মোবাইল নেই।
আমি : নাম্বার দিন, কথা বলিয়ে দিচ্ছি।
স্যার : না না বাবা, মোবাইলেতো মেয়ের পা ধরে মাফ চাইতে পারবো না। পরে যদি নিষেধ করে দেয়। [আমি বলছি আপনার মেয়ে কোনদিন আপনাকে তাঁড়িয়ে দেবে না। এক প্রকার জুড় করে স্যারের ডায়রী দেখে স্পিকার অন করে ডায়াল করলাম।]
আমি : হ্যালো, আপনি কি রুহানা ?
অপরপ্রান্ত : জ্বী, কে বলছেন ?
আমি : একখানা সুখবর দেওয়ার জন্য ফোন করলাম।
অপরপ্রান্ত : কিসের সুখবর ?
আমি : কিছুক্ষনের মধ্যে আপনার বাবা অর্থাৎ স্যার রেল স্ট্যাশনে পৌঁছাবেন।
[ফোনের অপর প্রান্তে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো "এই শুনছো আব্বা আসছেন । চলো আমরা স্ট্যাশনে যাই, হাসিব চল বাবা, তোর নানা ভাই আসছে, চল স্ট্যাশনে যাই। কিছুক্ষন পর স্ট্যাশনে ট্রেনটি ধীর গতিতে চলছিলো। জানালা দিয়ে থাকিয়ে দেখলাম, ঘরের সাধারন কাপড় পড়া স্বামী/সন্তান সহ এক নারী অধীর আগ্রহে থাকিয়ে যাত্রী খুঁজছিলো। থাকানো দেখেই বুঝে গিয়ে স্যারকে বললাম 'আপনার মেয়ে'।]
স্যার : বেশ নার্ভাস স্বরে বললো "হুম বাবা"।
আমি তাদেরকে ইশারা দিতেই ওরা দর্জার সামনে এসেই, মেয়ের স্বামী ভাঙ্গা সুটকেসটা নিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করলো। মেয়েটি বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাদঁছিলো। স্যারের চোখ ভরা অশ্রু আমাকে বিদায় দিলো। ট্রেন ছুটতে লাগলো। মেয়ে, জামাই আর নাতি স্যারকে ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে যাচ্ছে আর ট্রেনটির দিকে থাকাচ্ছিলো।

মেয়েটির কান্না দেখে মনে হলো– মা তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে বহুদিন পর ফিরে পেলো।

সিভিলের সাত ব্যাঙ

সাদিয়া জাহান
টেক : সিভিল, পর্ব : ৩য়/১ম

যেহেতু গল্পের নাম সিভিলের সাত ব্যাঙ। সুতরাং, বুঝতে হবে সিভিল ৩য় পর্বের ১ম শিফটের সাতজনকে নিয়ে লিখছি। তবে যাদের নিয়ে লিখছি তাদের মধ্যে আমিও একজন। আসলে গল্পের নাম এরকম দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা এই সাতজন খুবই ঘনিষ্ঠ। আর আমাদের দুষ্টমিগুলোও অনেকটা ব্যাঙের মতো। এখানে কাউকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে লিখছি না। এটা শুধুমাত্র একটু মজা করার জন্য এখানে আমাদের স্বাভাবিক কর্মকান্ডের কোন মিল নেই আর এখানে আমাদের সাত ব্যাঙের নামের সাথে যদি পাঠকবৃন্দ কারো নাম মিলে যায়, দয়া করে তারা যেন কিছু মনে না করে। যাই হোক, আগে ব্যাঙগুলোর পরিচয় দেই প্রথমেই আছে 'জসিম মিয়া'(ভদ্র ব্যাঙ), ২য় হচ্ছে 'জহির'(ব্যাঙের সর্দার), ৩য় হচ্ছে 'ফজলে রাব্বি'(ব্যাঙের ছানা), ৪র্থ 'আমি'(অতিথি ব্যাঙ), ৫ম হচ্ছে 'রুমা'(স্মার্ট ব্যাঙ), ৬ষ্ঠ হচ্ছে 'শাকিলা'(মিষ্ঠি ব্যাঙ) এবং সর্বশেষ 'জান্নাতুল ফেরদৌসি রাফি'(ডিমান্ডিং ব্যাঙ)। ব্যাঙের পরিচয় তো শেষ এখন আসা যাক তাদের লাফালাফির হিসাবে। যদিও জসিম খুবই ভদ্র তবুও সেও মাঝে মাঝে দু একটা লাফ দেয়। কিন্তু ব্যাঙের সর্দার সে খুব রাগী। সে লাফালাফি করে না ঠিকই কিন্তু কাউকে লাফালাফি করতেও দেয়না। আর আমাদের পুকুর যেটা সেখানে আরো অনেক ব্যাঙ আছে। যদিও এই গল্পে তাদের তেমন ভূমিকা নেই। আর আমি হলাম অতিথি কারন এখানে বাকি ছয়টি ব্যাঙই স্থায়ী হবিগঞ্জের। শুধু আমিই অন্য জেলার। তবুও ওরা আমাকে অনেক যত্ন সহকারে বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু আমি অতিথি হলে কী হবে কখনো অতিথ্যের মর্যাদা রাখি না। বরং ওদের চেয়ে বেশি লাফাই আমি। আর বাচ্চা ব্যাঙটা সবসময় সর্দারের পিছে পিছে চেলার মতো ঘুরে। সর্দারের অগোচরের দু একটা লাফ দেয় কিন্তু যেই চোখ পড়ে অমনি সব বন্ধ। কিন্তু মিষ্টি ব্যাঙ আর ডিমান্ডিং ব্যাঙকে দেখলে বুঝাই যায় নি যে ওরা লাফালাফি করে। ওদের লাফালাফির পূর্বাভাস পাওয়া যায় না। কখন যে হঠাৎ করে লাফালাফি শুরু করে বোঝা মুশকিল। আর স্মার্ট ব্যাঙ সবকিছু দেখে। দেখতে দেখতে সেও মাঝে মাঝে ভুল করেই হোক আর সজ্ঞানে হোক লাফ দেয়। কিন্তু লাফ দিতে গিয়ে একটু ও সতর্ক হয় না। এইতো সেদিন কী কারনে জানিনা হঠাৎ করেই মারল একটা লাফ। ভাগ্যিস অল্পের জন্য ব্যাঙটা ভাঙ্গেনি। ভাঙলে আর কী সব ঠেলা গিয়ে পরে সর্দারের উপরে। তবে আমার মনে হয় আমার চেয়ে কেউ বেশি ঠ্যাঙ ভাঙ্গেনি। ভদ্র ব্যাঙতো রীতিমতো বড় বড় চশমা পড়ে পুকুরের এক পাশ থেকে অন্য পাশে ঘোরাঘুরি করে। তবে মাঝে মাঝে সর্দারকে সাহায্য করে। এইতো সেদিন সর্দার আয়নায় দেখছে যে তার গোফ লম্বা হয়ে গেছে। এখন কী করবে। তো ভদ্র ব্যাঙ পরামর্শ দিল কাটতে। কিন্তু কাটবে কে। ওতো সর্দার। নিজের গোফ নিজে কী করে কাটবে। কাটার ভার পড়ল গিয়ে বাচ্চা ব্যাঙটির উপর। কিন্তু সে তো বাচ্চা। না আগে কখনো গোফ কেটেছে না কাটতে জানে। কিন্তু সেই কথাটি সর্দারকে তো আর বলতে পারে না। সর্দার যে হয়েছে তেমন, কারো মুখে না শব্দটা শুনতে রাজি না। এইতো কিছুদিন আগের কথা, স্মার্ট ব্যাঙ, মিষ্টি ব্যাঙ, আর আমি পুকুরের পাড়ে বসে গল্প করছিলাম। ডিমান্ডিং ব্যাঙ তখন ছিল না। সে আবার বৃষ্টির পানি দেখে নিজেকে সামলাতে না পেরে কতই না লাফালাফি করল। ব্যাস, সেদিন থেকেই সর্দি, কাশি শুরু । সর্দার তখন ছিলনা। কী একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলো। থাকলে ওকে ধরে একটা আছাড় মারত। পরে যখন এসে শুনেছে এই অবস্থা, তখন আর কী করে বাচ্চা ব্যাঙটাকে হুকুম দিল সবসময় ওর খেয়াল রাখতে। যেই কথা, সেই কাজ। সেদিন থেকেই বাচ্চা ব্যাঙটার চোখে ঘুম নেই। বেচারা ডিমান্ডিং ব্যাঙের সেবা করতে গিয়ে নিজেই শুকিয়ে আধমরা হয়ে যাচ্ছিল। পরে দুজনকেই হাসপাতালে পাঠানো হল। তো, সেদিন বসে গল্প করছিলাম এমন সময় সর্দার এসে বলল, ওর জন্য আমের ভর্তা বানাতে। কিন্তু আমরা তখন বলছিলাম যে, একটু পরে দিব। তখন আর কী, সর্দার তো রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমাদের তিনজনকে ঘাড় ধরে পুকুরে দিল ফেলে বলল তিনদিন পর্যন্ত তোদের খাওয়া বন্ধ। এই দৃশ্য আবার বাচ্চা ব্যাঙটা সামনাসামনি দেখেনি। কারন ও তখন হাসপাতালে ছিল। পরে যখন গল্পের ছলে শুনেছে। ব্যাস ভয়ে কাঁপাকাঁপি শুরু করে দিল। আমি ভাবছি, শুনেই ওর এই অবস্থা, সামনে থাকলে ও কী করত। আমার মনে হয় ভয়ে ও সেদিন অজ্ঞান হয়ে যেত। এই ভয়ের জন্যই ও সর্দারের কোন কথা অমান্য করে না। পারুক আর না পারুক তবুও করে। কারন ও জানে, সর্দারের কথা অমান্য করলে কোনদিন ওর ঠ্যাংটাই না ভেঙে দেয়। তবে, সর্দার কিন্তু এতটাও রাগী না। সে শুধু নিয়মের মধ্যে থাকতে চায়। তবে সে আমাদেরকে খুব ভালবাসে। কোথাও গেলে আমাদেরকে ঘুরতে নিয়ে যায়। আমাদের অনেক কিছু খাওয়ায়। আমরা সবসময় একসঙ্গেই থাকি। আমরা এই সাতটি ব্যাঙ সবসময় একে অন্যের কষ্টে পাশে দাড়াই। আর আমরা সবসময়ই প্রচুর দুষ্টমি করি। এজন্যই আমরা সাতজন হলাম সাতটি ব্যাঙ।

গল্প

আলো

মৌ সাহা
ডিপার্টমেন্ট : সিভিল-৩/২.

নিশান : এই মেয়ে রাস্তার মাঝখানে কি করো, এখনই তো গাড়িটা ধাক্কা দিতো।

মেয়েটি : ভালা হইতো মরি যাইতাম।

(১০-১১ বছরের মেয়ের মুখে এই কথা শুনে অবাক হলো নিশান)

নিশান : নাম কি তোমার ?

মেয়েটি : তিথি

নিশান : পিচ্চি মেয়ে মরার কথা বলো কেন ?

তিথি : বাঁচমু কি শখে, আল্লাহ মোরে তুলি নেয়না কেন (কাঁদতে কাঁদতে বললো)

নিশান : কাঁদছো কেন, তোমার বাড়ি কোথায় ?

তিথি : বাড়ি নাই আমার

নিশান : বাবা-মা ?

তিথি : নাই, আমার কেউ নাই, কিচ্ছু নাই।

নিশান : থাকো কোথায় তাহলে ?

তিথি : বাপ-মা মরার পরে চাচার বাড়িত থাকতাম, এইন দুইদিন ধইরা রাস্তায় থাকি।

নিশান : কেন ?

তিথি : চাচি আমারে সারাদিন মারে, কাজ করায়, চাচা একটা খারাপ মানুষ।

নিশান : খারাপ মানুষ কেন, চাচাও মারে নাকি ?

তিথি : না বুড়ার স্বভাব ভালা না, গায়ে হাত দেয়।

(নিশান কিছুটা ভেবে বুঝতে পারলো মেয়েটা কী বলতে চাইছে আর হতবাকও হলো। এই মেয়েটিও পুরুষের নোংরা মানসিকতার শিকার হয়েছে। আর বর্তমানে তো দুই বছরের বাচ্চাও রেহাই পায় না।)

তিথি : ভাইয়া কিছু খাইতে দিবেন ? কত মানুষের পা ধরলাম, ভিক্ষা চাইলাম কারো দয়া হইলো না। দুইদিন ধইরা না খাইয়া আছি। মরণ আসবো আমার।(কাঁদতে কাঁদতে আক্ষেপ করলো তিথি)

নিশান : কেঁদো না তুমি চলো আমার সাতে, বোন।

তিথি : কোথায় যাইবো ভাইয়া ?

নিশান : যেখানে গেলে তোমার আর মরতে ইচ্ছা হবেনা সেখানে।

তিথি : খাওন পামু তো ?

নিশান : হুম, চলো।

(নিশান তিথিকে নিয়ে গেলো এক অনাথ আশ্রমে যেখানে তিথির মতই আরো অনেক ছেলে মেয়ে থাকে। নিশানকে দেখে সবাই দৌড়ে এসে ভাইয়া বলে জড়িয়ে ধরলো।)

নিশান : শোনো পিচ্চিরা, ও হচ্ছে তিথি। তোমাদের নতুন বন্ধু। তোমাদের সাথেই থাকবে।

তিথি : আমি এইখানে থাকমু ভাইয়া, সত্যি!

নিশান : একদম সত্যি। ওদের সাথে থাকবে, খেলবে, পড়ালেখা করবে, আর খেতেও পারবে। খুশি তো এখন ?

তিথি : অনেক খুশি ভাইয়া, আপনি অনেক ভালো, লক্ষি ভাইয়া।

নিশান : আচ্ছা।

রাজ : ঠিক বলেছো, ভাইয়া সত্যিই অনেক ভালো। আমি তো আগে পকেটমার ছিলাম, চুরি করতাম, ভিক্ষা করতাম। ভাইয়া আমাকে রাস্তা থেকে তুলে এখানে নিয়ে আসছে। আমি এখন পড়ালেখা করি, আনন্দ করি। জানো ভাইয়া বলছে আমি পুলিশ হবো।

তিথি ; আমার অনেক শখ ছিলো আমি পড়ালেখা করমু, আর আমার বাপ কইতো আমারে ডাক্তার বানাইবো। কিন্তু পড়ার সুযোগই পাইলাম না। তার আগেই বাপজান মরি গেলো।

নিশান : আমি তোমার বাবার স্বপ্ন পূরণ করার সুযোগ করে দেবো তোমাকে।

তিথি : সত্যি বলছেন ভাইয়া!

নিশান : একদম সত্যি। যাও সবার সাথে ভিতরে যাও।

তিথি : আচ্ছা।

(বাচ্চারা সবাই আনন্দ করতে করতে তিথিকে নিয়ে চলে গেল, তিথির মুখে আজ হাসি, নতুন জীবন পাওয়ার আনন্দ)

নিশান তিথির হাসিভরা মুখটা দেখে অনাথ আশ্রমের দিকে তাকালো। উপরে বড় করে লেখা আছে "আলোর সন্ধানে", পথশিশুরা তো আমাদেরই ভবিষ্যতের আলো। কিন্তু মনুষ্যত্বের অভাবে আজ তারা অন্ধকারে বিলীন হতে চলেছে। কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকায়না। কেউ তাদের মুখে হাসি ফোটানির চেষ্টা করেনা। তাদেরও তো অধিকার আছে জীবনকে উপভোগ করার। আমরা কি পারিনা পথশিশুদের পাশে এসে দাঁড়াতে। তিথির মতো সবার মুখে হাসি ফোটাতে। সবার মিলিত চেষ্টায় তাদের জীবনে আলো এনে দিতে। যাতে ভবিষ্যতে তারা দেশের স্বার্থে কাজ করতে পারে। তাদের জ্ঞানের আলোয় আমাদের দেশকে আলোকিত করে রাখতে পারে।

ঘুড়ে দাঁড়ানো সেই মেয়েটি

জিহাদ পারভেজ
কম্পিউটার টেকনোলজি, ১ম পর্ব, ১ম শিফট

বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ছোট একটি গ্রাম। নাম তার স্বপ্নপুরী। স্বপ্নপুরী সত্যিই স্বপ্নের রাজ্যের মতই। গাছ-গাছালিতে ভরপুর, পাখির কলতানে মুখর গ্রামটি, আসলেই ভারি মিষ্টি। এ গায়ে বসবাস করে খন্দকার সাহেব ও তার স্ত্রী এবং তার একটি ছেলে। মধ্যবিত্ত এই পরিবারটি সর্বদাই খুশিতে পরিপূর্ণ থাকে। দিনের পর দিন ভালো ভাবেই কেটে যায়। বেশ কিছু বছর পর সেই পরিবারে পূর্ণিমা চাঁদের মতো একটি কন্যা শিশু জন্ম নেয়। বাবা খন্দকার সাহেবের আনন্দ দেখে কে! পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ ও খুব খুশি হয়। একের পর এক মানুষের ভীড়ে বিন্দুমাত্র জায়গা ছিল না ঘরটিতে। বাবা, আদর করে নাম রাখে তার তরী। দিনের পর দিন একটু একটু করে বড় হতে লাগে সে। কিন্তু বাবার ভালোবাসা তার কপালে জুটেনি বেশিদিন। কেননা, শুকের সাগরে সকলকে ভাসিয়ে চলে যান পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে। বাবার আদরটা পরিপূর্ন্য পায়নি সে। কারন, সে তখন ছোট। বাবার মৃত্যুর পর পরিবারটি অভাব-অনাটনে পরে যায়। বেশ কিছুদিন পড়ে, পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহন করে ভাইটি। ছোটখাটো একটা চাকরী করেন তিনি। বাবার স্বপ্ন ছিলো ছোট্ট মেয়েটিকে একজন আদর্শবান আইনজীবি বানাবেন। তাই, বাবার স্বপ্নের কথা ভেবে ভাইটি পরিবারকে শহরে আনেন। কেননা, তখন এই গ্রামে পরিপূর্ন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ও ছিলো না। তাই, শহরের কোনো এক স্কুলে ভর্তি করে দেয় মেয়েটিকে। তখন থেকেই তার শিক্ষাজীবন শুরু। শহরের নতুন পরিবেশের সাথে খাপ-খাওয়াতে তার সমস্যার সম্মুখীন হতে যায়। আস্তে আস্তে মোটামুটি ঠিক হয়ে যায়। সে খুব মিশুক প্রকৃতির মেয়ে। অল্পতেই বন্ধুত্ব করে ফেলে সবার সাথে। ছাত্রী হিসেবে অনেক ভালো। এক কথায় স্যার মেডামদের চোখের মনি। সকল পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উর্ত্তীন হয় সে। বাবার স্বপ্ন পূরনের লক্ষ্যে ছুটে সে। কিন্তু অসুস্থতার কারনে সে মাধ্যমিকে খারাপ রেজাল্ট করে ভেঙ্গে পরে সে এবং পরিবারের সবাই। দাদি বলে," কইছিলাম যে মাইয়াগর এত লেহাপড়ার দরকার নাই, যাক অহন মাইয়াডারে বিয়া দিয়া দে।" একথা শুনে সে আরো ভেঙে পরে। কিন্তু মা এবং ভাইয়ের অনুপ্রেরনায় আবার সে ঘুরে দাড়ায়। আবার সে চেষ্ঠা করে এবং কঠোর পরিশ্রম করে। দিনরাত পড়ালেখাতে ব্যস্ত থাকে উচ্চমাধ্যমিকে সেরা রেজাল্ট করেছে। ভালো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। লেখাপড়া শেষে আজ বড় একজন আইনজীবি। সারা বাংলা দেশের মানুষ এক নামে চিনে। শুধু পরিবারের সহযোগীতায় ও সমর্থনে।

"আজ আমাদের দেশের নারীরাও দেশের একটি অংশ। তাদের হেয় চোখে দেখা উচিৎ নয়। একটু অনুপ্রেরণা পেলেই তারা নিজের যোগ্যতাকে সকলের কাছে তুলে ধরতে পারে। যেমনটি তরীর ক্ষেত্রে হয়েছিল। সবার আগে প্রয়োজন পরিবারের সদস্যদের সচেতনতা ও সহযোগিতা। তবেই বাংলাদেশে সোনার দেশে পরিণত হবে। তাই কবির ভাষায়, "পৃথিবী যা কিছু চির কল্যান কর, অর্ধেক করিয়াছে নারী- অর্ধেক তার নর।"

লোডশেডিং

মোঃ শাকিল তালুকদার
ইলেক্টনিক্স টেকনোলজি, ১ম সেমিস্টার

বিদ্যুৎ আধুনিক সভ্যতার প্রধান চালিকা শক্তি। যে সব এলাকায় বিদ্যুৎ শক্তির সরবরাহ রয়েছে, সে সব এলাকায় প্রত্যেকেই লোডশেডিং শব্দটির সাথে পরিচিত। লোডশেডিং বা বিদ্যুৎ বিভ্রাট এর অর্থ হল নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ শক্তির সরবরাহে ঘাটতি বা বিঘ্নঘটা। এটি আমাদের দেশের সর্বত্র একটি নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। বিবিধ কারণে লোডশেডিং হয়ে থাকে। অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এর অপরিকল্পিত বন্টন লোডশেডিং এর দায়ী। মানুষ যখন বিদ্যুৎমুখী জীবনযাপনে অভ্যস্ত, সেখানে লোডশেডিং একটি অভিশাপ স্বরূপ। লোডশেডিং এর কারণে শিল্পাঞ্চলগুলো দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। বিদ্যুতের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়। কলকারখানার উৎপাদন হ্রাস পায়। হঠাৎ করেই রাস্তাঘাট সমূহ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, প্রদীপ, চার্জ লাইট এবং মোমবাতির স্বল্প আলোয় বড় দোকান বা বাজার সামান্য আলোকিত হয়। দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকার ফলে রিফ্রেজারেটরে রাখা সহেজ খাবার নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে গবেষণাগারে রকিষত বিভিন্ন দ্রব্য এবং ঔষধ যেগুলো নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় এবং রিফ্রেজারেটরে রাখা হয়, সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। চোর এবং পকেটমাররা রাস্তায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। লোডশেডিং এর কারণে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি সীমাহীন, বিশেষ করে পলিটেকনিকসহ সকল পরিক্ষার্থীদের। এতে তাদের পড়াশুনায় বিঘ্ন ঘটে।

লোডশেডিং এর অভিশাপ হাসপাতালগুলোকেও রেহাই দেয় না। জরুরী অপারেশনের সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে রোগীর অবস্থা কেমন হতে পারে তা বর্ণনা করা যায় না। তাছাড়া গরমকালে প্রচন্ড গরমে মানুষ ঘুমাতে পারে না। মোটের উপর লোডশেডিং আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাই লোডশেডিং সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারের উচিত অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা এবং পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশের সাথে চুক্তি করে চুল্লি স্থাপন করা। কেননা এ চুল্লি থেকে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। এ ছাড়া অবৈধ সংযোগ, সিস্টেম লস এবং বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করতে হবে। এভাবে আমরা লোডশেডিং ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারি।

গল্প

ওলীউল্লাহ চৌধুরী

ডিপার্টমেন্ট : ইলেকট্রনিক্স ৫/১

যদি এই মুহূর্তে শুনতে পান আপনি ক্যান্সারে আক্রান্ত, আর এক সপ্তাহ বাচঁবেন। তখন আপনার কি একবারের জন্য ও দুঃখ হবে– কেন আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্স পাননি কেন আপনি সবচেয়ে ভালো চাকরিটা পাননি ? ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে যখন মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটপট করবেন, তখন আপনার কি একবারের জন্য আফসোস হবে যাকে আপনি সবচেয়ে ভালোবাসতেন তাকে কেন হারাতে হলো এটা ভেবে! এসব কিছু তখন আপনার মাথায় আসবে না। ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর কাছে দেশসেরা ভার্সিটিতে চান্স না পাওয়ার দুঃখ তাকে না, বন্ধুর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তাটা তখন মাথায় আসে না। ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরি মেয়েটিকে, হ্যান্ডসাম ছেলেটিকে ভালোবেসে বিয়ে করতে না পারাটাকেও তখন কোনো আফসোস মনে হয় না।

তখন আর একটা বছর, একটা মাস বেঁচে থাকতে পারাটাই স্রষ্ঠার কাছে তার শ্রেষ্ঠ চাওয়া হয়ে যায়। আজ কতশত রোগীই তো মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে হাসপাতালে, আজকে আপনি আমিও এসব রোগীর তালিকায় থাকতে পারতাম। আজকের দিনটাতে যে এখনো বেঁচে আছি এটাই তো অনেক। তাই সামান্য কিছু না পাওয়ার চিন্তায় জীবনের আনন্দ মাটি করে দিবেন না। আজকে ভার্সিটিতে চান্স না পাওয়ার দুঃখ বুড়ো বয়সে থাকবে না। আজকে ভালোবাসার মানুষকে হারানোর দুঃখটা থাকবে না। কোনো দুঃখ ওই বেশি দিন থাকবে না। কাজেই আজকের সুন্দর সময়টা কেন অযথা দেশসেরা ভার্সিটিতে চান্স না পাওয়ার চিন্তায়, দামী ক্যারিয়ার গড়তে না পারার দুঃখে, ভালোবাসার মানুষকে কাছে না পাওয়ার কষ্ঠে শেষ করে দিচ্ছেন ? প্রতিটি দিনই আনন্দের সুখের। এত কিছুর মাঝেও যে আমরা বেচেঁ আছি এটাই তো প্রকৃত সুখ।

মায়ের ডাক

মোঃ ইমন কবির
সিভিল টেকনোলজি, সেমিষ্টার-১ম, শিফট : ১ম

বিকেল ৪টা অফিস থেকে গিয়ে বাসায় আসলাম। অফিসে ভীষণ কাজের চাপ, তাই দুপুরে খেতে পারলাম না। বাসায় এসে তাড়াতাড়ি গোসল করে খেতে বসলাম। এমন সময় কে যেন দরজায় কড়া নাড়ল,

তীক্ষ্ম মেজাজে বলতে লাগলাম এ অসময় আবার কে আসল?

বিরক্ত হয়ে দরজা খুলতেই দেখি পিওন,

আচমকা হয়ে বললাম– কি ব্যাপার চাচা আপনি এই অসময়ে।

পিওন তখন বলল- তোমার বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে, এই বলে চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে চলে গেলো।

খামের উপর লেখা " মায়ের ডাক" । চিঠিখানা খুলতেই দেখি বড় বড় অক্ষরে লেখাঃ

মুরাদপুর
কুমিল্লা
১০/১২/১৯৯৮ইং

প্রিয় পুত্র আমার,

আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছো, গ্রামে প্রচন্ড শীত, গাঁ-টা কাপতেছে। কপালে হাত দিয়ে দেখি গরমে যেনো কপাল পুড়ে যাচ্ছে। হয়ত জ্বর উঠেছে। মাথা যেন ভারি হয়ে আসছে। বিছানা থেকে উঠে বসব তাও সাহস পাচ্ছি না। নিশক্তি দেহ নিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি বলতে পারি না। চোখ খুলে দেখি তোমার চাচাতো বোন রিমা আমার মাথায় পানি ঢালছে। প্রিয় পুত আমার আজ মনে হচ্ছে এই দুনিয়াতে বেশিক্ষণ থাকবার নয়। দূর আকাশের ওই তারাগুলো আজ আমায় তাদের কাছে ডাকছে।

পুত্র আমার, তোমার কাছে আমার একটাই অসিয়ত রেখে গেলাম, হতে পারে আদেশ বা উপদেশ। যা তোমার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে কাজে দিবে।

এমন কিছু করো না যার জন্য তোমার এবং তোমার পরিবারের উপর আঙ্গুল উঠে।

তোমার কি আছে তোমার শরীরে লেখা নেই। কিন্তু তোমার আচার-আচরণ ব্যবহারে বুঝা যাবে তোমার পরিবার কোথায়।

কখনও কাউকে কামলা, কাজের লোক বা বুয়া বলে ডেকো না, মনে রেখো তারাও কারো না কারো ভাই-বোন, বাবা-মা। তাদের সম্মান দিয়ে ডাকো।

সবসময় ভদ্র ও নম্রভাবে চলো এবং কথা বলো, কিন্তু অন্যায়ের সাথে আপোষ করো না।

আজ আর নয়, কেমন আছো জানিও। তোমার প্রতি রইল দোয়া ও ভালোবাসা।

ইতি–
তোমার 'মা'

চিঠিখানা পড়ে আর বাসায় থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না। পকেটে ছিল ৩০০ টাকা তা দিয়ে গাড়ি ভাড়া হয়ে যাবে। বন্ধু সাব্বিরকে বললাম- আমি এখন বাড়ি যাব 'মা' খুব অসুস্থ। সাব্বির বলল, তোদের বাড়ি তো অনেক দূর। যেতে যেতে রাত হয়ে আসবে। আবার চোর-ডাকাতির ভয় তো আছে-ই, সকালে রওয়ানা দিলেই তো হয়। আমি বললাম- যতই বিপদ আসুক না কেনো বাড়িতে আমার যাওয়া লাগবেই। 'মা' যে খুব অসুস্থ।

বিকাল ৪.৩০ মিনিট আমি রওয়ানা হলাম, ৫টা বাজে ট্রেন ছাড়বে, ট্রেনে উঠলাম- ট্রেন চলতে লাগল ঝক্ ঝকা ঝক্ । এদিকে আমার খুব খিদে, দুটি কলা ও একটি পাউরুটি খেলাম। ট্রেন যে আনমনে ছুটে চলেছে, যেভাবেই হোক আমার গন্তব্যে ফিরিয়ে দিবে।

রাত তখন ৮টা স্ট্রেশন চলে আসল। স্ট্রেশন থেকে মহিষের গাড়ি দিয়ে আমাদের বাড়ি যাওয়া লাগে। আজ স্টেশনে কোনো মহিষের গাড়ি নেই, রাত ৮টা মানেই এক গভীর রাত। চারিদিকে চুপচাপ নির্জন অন্ধকার। আপছা মিটি-মিটি আলোতে স্টেশন এর পাশে একটা দোকান দেখা যাচ্ছিল। দোকানটির সামনে গিয়ে দেখি, এটি একটি ঔষধের দোকান। যাক বাবা, মায়ের জন্য ঔষধ তো নিতে পারব। কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে দেখি "মানিব্যাগ উধাও"। ট্রেনে যখন ছিলাম, মানুষের ভিড়ে হয়ত মানিব্যাগ পড়ে গেছে বা ছিনতাইকারীর হাতে পড়েছে তো। মায়ের জন্য ঔষধ নিতে পারলাম না।

তাই হাঁটতে শুরু করলাম, নিজের গন্তব্যের দিকে। আমাদের গ্রামে নেই বিদ্যুৎ। সন্ধ্যা হলে যেন রাত ঘনিয়ে আসে। যেন এক 'অজপাড়া গাঁ' পূর্ণিমার আলোয় বেশ রাস্তা দেখা যাচ্ছে, গাছগুলোকে মনে এক একটা দৈত্য, একটু একটু ভয় লাগছে। কোথা থেকে যেন একটা কুকুর আসল, যাক কুকুরটিকে দেখে ভয় দূর হলো, মনে হচ্ছে কুকুরটি আমার পথের সঙ্গী হতে এসেছে।

আমি বললামঃ কিরে কুকুর আমার 'মা' এর খবর এনেছিস কি? আমার মা-কি তোকে আমার কাছে পাঠিয়েছে! এখন কেমন আছে রে আমার 'মা'। আমি একা একা বক বক করতে লাগলাম কুকুরটির সঙ্গে। হঠাৎ চিৎকার আসল, হরে রে রে রে চার-পাঁচজন লোক আমায় চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল। আমি বলাম কে ভাই তোমরা,

একজন বলে উঠল, ডাকাত যা আছে সব দিয়ে দে, ভয়ে আমার প্রাণটা ছটফট করছে।

বুদ্ধি খাটিয়ে বললাম, ডাকাত ভাই আমি যদি তোমাদের দেই কম পাবে। বরং তোমরা খুঁজে নাও বেশি কিছু পেতে পারো। একজন এগিয়ে এসে বলল, বেটা তো মন্দ বলিস নি, আমি দেখছি কি কি আছে তোর কাছে।

আমার পকেট থেকে লোকটা চিঠিখানা পেল। একজন বলতেছে, সরদার ওর কাছ থেকে একটা কাগজ পেয়েছি। দেখেন তো কি লিখা। ডাকাতের সরদার চিঠিখানা পড়তে লাগল অঝরে অশ্রু তার চোখ দিয়ে ঝড়ছে। আমায় বলতেছে, মায়ের জন্য কি ঔষধ কিনেছিস? আমি সব কিছু ডাকাতের সরদারের কাছে খুলে বললাম, সে ৮০ টাকা আমায় দিলো। বলল, এটা আমার 'মা' মরার আগে আমায় দিয়ে গিয়েছিল। আজ সেই মায়ের টাকা আরেক মায়ের জন্য কাজে লাগবে। টাকা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদায় নিলো।

আমরা মানুষের বাহিরটা দেখে তাদের কখনো খারাপ বলতে পারি না, পরিবেশ ও সমাজে অবহেলার কারণে আমরা খারাপ পথ বেছে নেই। পৃথিবীতে যেমন খারাপ দিক রয়েছে, খারাপের ভিতর ভালো দিকটা ও লুকিয়ে থাকে। তাই সমাজে যারা খারাপ রয়েছে তাদেরকে, ভালোবাসার মায়াজালে আটকিয়ে তাদের মনে ফুল ফোটাতে পারি।

আগে জানতাম না ডাকাতদেরও মনুষ্যত্ব রয়েছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সামনে আসল নদী। নদী পার হলেই আমাদের বাড়ি। নদীতে কোনো মাঝিও নেই। ঐ দিকে মা খুব অসুস্থ। যেকোনো ভাবেই হোক নদী পেরোতে হবে। পাঁচ-কাননা ভেবে নদীতে ঝাঁপ দিলাম। কনকনে শীত, শরীরটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। হাত-পা নাড়তে পারছি না। হঠাৎ কোত্থেকে যেনো একটা কলা গাছ স্রোতের সাথে ভেসে আসছে। কলাগাছটির উপর ভর করে সাতঁরিয়ে নদী পাড় হলাম। পুরো শরীর ভিজে আছে, কনকনে শীতে হাত-পা কাঁপছে। পায়ে শক্তি পাচ্ছি না, কচ্ছপের ন্যায় ধীর গতিতে হাঁটতে লাগলাম। বাড়ির উঠনে পা রাখতেই শুনি বাতাসের সাথে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। বুকটা ছটফটিয়ে উঠল। দৌঁড় দিয়ে দরজার সামনে গেলাম, দরজাখানা ধাক্কা দিতেই খুলো গেলো 'মা' শুয়ে আছে মাটিতে। পাতলা একটা চাদর দিয়ে মায়ের শরীর ঢাকা। মায়ের পাশে-ই আগরবাতির ধোঁয়া আসছে। পাশে চাচী বসে বসে কাঁদছে।

কি গো চাচী কাঁদছেন কেন? আর 'মা' কেন এভাবে শুয়ে আছে!

চাচী বলল- বাবা তুমি আসতে অনেক দেরি করে ফেলেছো। তোমার 'মা' আমাদেরকে রেখে চিরদিনের মত চলে গেছে।

হঠাৎ যেন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কয়েক মুহূর্তের জন্য একদম নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম। বিদায়ের শেষ মুহূর্তে 'মা' আমায় দেখতে পেলো না। আমার একা রেখে চিরদিনের মতো চলে গেল।

আজ প্রতিদিন অপেক্ষা করি আবার হয়ত কেউ চিঠি নিয়ে আসবে 'মায়ের ডাক'। আবার সেই উপদেশগুলো নিয়ে এখন শুধু সেই চিঠির আশায় রয়েছি। কবে আসবে সেই 'মায়ের ডাক'।

আলতা ফড়িং

মোছাঃ রনি আক্তার রুমি
সিএমটি (৩/১)

বিকেল বেলা উঠোনের এক কোণে বসিয়া আনমনে কি যেন ভাবিতেছে। এমন সময় তাহার দিদি আলতা কোথা থেকে আসিয়া ডাকিল, ফড়িং ও ফড়িং...

ফড়িং চমকিয়া উঠিয়া কহিল-কে?

আলতা-আয় এদিক শোন।

আলতার বয়স বার বৎসর। ফড়িং তাহার হইতে তিন বৎসর এর ছোট। আলতা ফড়িং এর মত এতটা ফর্সা নয়। মাথার চুলগুলি এলোমেলো, চোখগুলি বেশ ডাগর, ডাগর, হাতে কাঁচের চুড়ি, পরণে ময়লা কাপড়।

আলতার হাতে একখানা ময়লা থলে। তাতে কতকগুলি ছোট ছোট কাপড়ের টুকরো।

আলতা সুর নিচু করিয়া বলিল, মা মুখুর্য্যের বাড়ি থেকে আসেনি তো?

ফড়িং মাথা নাড়াইয়া বলিল-উহু, তুই কই গেছিলি দিদি?

আলতা- আয়না, এদিক শোন, দ্যাখ দর্জ্জি বাড়ি গেছিলুম। পুতুলের খেলনা কাপড় নিয়া আইছি।

ফড়িং দিনি তর পুতুলের কাপড় থেকে আমার পুতুলের লাগি দুইডা কাপড় দিবি?

আলতা- ওহ! শখ কত। তখন যে বলেছিলুম চল আমার সাথে দর্জি বাড়ি। তখন তো যাস নাই। এখন কেন চাইতেছস?

তখন আলতা-ফড়িংএর মা অভাগিনী ঘরে আসিয়া পড়িল। স্বামী মরে যাওয়ার পর থেকে সংসার চালানোর জন্য অভাগিনী অন্যের বাড়িতে কাজ করে। কোনো রকম সংসার চলে তাহার। তবুও কোনো দুঃখ নেই, মেয়ে দুটোর মুখে খানা তুলিয়া দিতে পারিলেই সে মহা খুশি।

সে-বার দুগ্গা পূজায় মেয়ে দুটোকে নতুন কাপড় দিতে না পারিয়া খুব কাঁদিয়াছিল অভাগিনী।

দুই বোন ঝগড়াঝাটি হইলেই আলতা বলিয়া উঠে-

আলতা- তুই তো আমার বইন না, আমার মায়ের পেটের বইন না, তাই ঝগড়া করছ আমার সাথে।

ফড়িং- কি কইলা দিনি?

আলতা- হ, তুই কী আমার আপন বইন নাকি! তরে তো বাবায় পুলের তলে কুড়াইয়া পাইছিল। তারপর তর ওই বাদড় মুখ দেইখা বাবার মায়া লাগছিল। তাই তরে বাড়িতে নিয়া আইছে।

এই শুনিয়া ফড়িং এর সে কি কান্না।

আজ নিয়া তিনদিন হইল আলতার ভীষণ অসুখ করিয়াছে (ম্যালেরিয়া)। পথ্য তো দুরের কথা ঔষধই কিনা হয় নাই।

আলতার শিয়রে বসিয়া মুখ আঁচলে ডাকিয়া ডুকরে ডুকরে কাঁদিতে লাগিল অভাগিনী।

পায়ের কাছে বসিয়া আলতার সাথে কাটানো অতীতের সেই সুন্দর দিনগুলোর কথা মনে পড়িতে লাগিল ফড়িং এর। মাস্টার বাড়ির আম গাছ থেকে আম পাড়তে গিয়ে মায়ের কাছে ধরা খেয়ে দুজনকেই বকা শুনিতে হয়েছিল।

ক্ষেত এর আইল হইতে ছোট ছোট মাছ ধরিয়া কতই না আনন্দ করিত তাহারা।

বনে-জঙ্গলে দুজনে মিলিয়া কতইনা ঘুরিয়াছে। কত রকমের খেলাই না খেলিয়াছে।

দিদিকে কারণে অকারণে মায়ের থেকে কত কথা শুনিয়েছে। দিদির কেন অসুখ হইল? দিদি আগের মত কবে ঠিক হইব? দিদির লগে কবে আবার মাছ ধরিতে যাইমু?

মনে মনে কতই না প্রশ্ন জাগিয়া ওঠে তাহার।

কিন্তু আজ দিদির যে বড্ড অসুখ।

এইসব ভাবিয়া নিজের অজান্তেই চোখ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আনমনে আলতার দিকে চাহিলা রহিল ফড়িং।

দক্ষতা অর্জন

মোঃ মোবাশ্বির মিয়া
ইলেক্ট্রনিক্স (৩/১)

বাংলার একটি প্রবাদ আছে, 'গুঁড়ের লাভ পিপড়ে খায়" অর্থাৎ আমরা গুড় বিক্রি করে যে পরিমাণ লাভ করছি উক্ত পরিমান গুড় পিঁপড়ে খেয়ে নিচ্ছে। তাহলে লাভটা কী হচ্ছে? এমনি করে দিন আমাদের যাচ্ছে। যদি এভাবেই দিন কেটে হয় আমাদের ইত! তবে বাকি দিনগুলোর হবে কী গতি? যদি এসব ভেবে আমাদের কিছুই না থাকে করার, তবে কী পরবর্তী প্রজন্ম মনে করবে, আমাদের অনুসরণ করা দরকার? এতক্ষণ তো অনেককিছু বললাম। এবার আমি মূল কথায়। মূল কথাটি হচ্ছে পিঁপড়েকে গুঁড় হতে দুর করতে হবে কিন্তু কিভাবে? সেটা আমাদেরকে জানতে হবে। জানতে অবশ্যই একজন জ্ঞানী লোকের কাছে যেতে হবে। এবং উনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলবেন তা করতে হবে। এতে যদি পিঁপড়ে দুর হয়, তবে লাভ হবে, হবে উন্নতিও। এখন আসুন বাস্তব জীবনে কীভাবে পিঁপড়ে দুর করা যায়। ধরুন, একটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছয়জন। এদের মধ্যে চারজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা। পুরুষদের মধ্যে একজন বাবা ও তিনজন ছেলে। এখনও তারা কেউ বিয়ে করেনি। লেখাপড়াও তেমন নেই বললেই চলে। এদের মধ্যে একজন সপ্তম শ্রেণি এবং একজন পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এবং বাকি আরেকজন স্কুলের বারান্দায়ও যায়নি। এদিকে মহিলা দু'জন মা ও মেয়ে। তারা ঘরের কাজকর্ম করে। ছেলেদের মধ্যে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়া একটি মুদিমাল বিক্রয়দের দোকান পরিচালনা করে এবং পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া অন্য একটি কসমেটিক্স দোকনে কর্মরত। আর তৃতীয়জন হালচাষে ব্যস্ত। হালচাষ করে বা অন্যের দোকানে চাকরি করে তেমন উন্নতি সম্ভব নয়। এদিকে তাদের একটি রাইস মিল ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই মিল পরিচালনা করতে পারে না। ফলে মিল পরিচালনা করার জন্য ড্রাইভার ভাড়া করতে হয়েছে। আর এসব ড্রাইভারদের পারিশ্রমিক ও একটু বেশি হয়ে থাকে। আবার মাঝে মাঝে মিলের এটা/ওটা নষ্ট হয়ে যায়। তখন মিস্ত্রি এনে ঠিক/মেরামত করতে হয় কোনো যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে গেলে পরিবর্তন করতে হয়। সব মিলিয়ে তেমন লাভবান হওয়া যাচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে ইজারা দিতে হলো। ইজারাও নিলো সেই ড্রাইভার, যাকে তারা ভাড়া করেছিল মিল পরিচালনা করার জন্য। অতপর ড্রাইভার মিল পরিচালনা করে আস্তে আস্তে অর্থনৈতিক ভাবে সে উন্নতি লাভ করছে। এদিকে মিলের প্রকৃত মালিকরা নামকাওয়াস্তে কিছু অর্থ পাচ্ছেন। কারণ আশেপাশের কেউ মিল পরিচালনা করতে না পারায় ইজারা নিতে কেউ আগ্রহী নয়। ফলে অল্প অর্থেই ইজারা দিতে হয়েছে। এখন ঘটনাটি যদি এরকম না ঘটতো প্রকৃত মালিকরা যদি মিল পরিচালনা করতে পারতো, তবে তারাও সহজে উন্নতি লাভ করতো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তারা কেন উন্নতি সাধন করতে পারে নি? উত্তরটি হবে, তার গুঁড় হতে পিঁপড়ে দুর করার কৌশল আয়ত্ত করতে পারেনি।

ঠিক তেমনি আমাদের দেশের অবস্থা সেই পরিবারটির মতো। দক্ষ জনশক্তি না থাকার ফলে প্রতিনিয়ত লোক বিদেশ থেকে লোক ভাড়া করে আনতে হচ্ছে। তাদের পারিশ্রমিক ও অত্যাধিক। তাদের পারিশ্রমিক যে কী পরিমাণ তার একটি ঘটনা বলি।

একদা আমি আমার ওস্তাদের সঙ্গে একটি পাওয়ার প্লান্টে এয়ারকন্ডিশনার মেরামতের কাজে গিয়েছিলাম। সেখানে যাওয়ার পর আমাদের বাঙালি একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। উনি আমাদেরকে কয়েকটি এয়ার কন্ডিশনার দেখালেন যেগুলো মেরামত করা প্রয়োজন। কিন্তু এয়ারকন্ডিশনারগুলো মেরামত করার জন্য আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় সব টুলস এবং কাঁচামাল ছিল না। তাই আমাদেরকে অন্যত্র আরেকটি এয়ারকন্ডিশনার দেখানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে আফ্রিকান একজন ইঞ্জিনিয়ার বাস করে। সেখানে যাওয়ার পর উনার সাথে আমাদের সাক্ষাত হল। বাসায় ঢোকার পর একটি টেবিলের উপর বান্ডেল বান্ডেল অনেকগুলো টাকা সাজানো। উক্ত টাকার পরিমান প্রায় কোটি টাকা। তখন আমি আমাদের সাথে থাকা বাঙালি ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞেস করলাম। এত টাকা এভাবে টেবিলের উপর কেন? তখন তিনি বললেন, উনাদের তো টাকার অভাব নেই, তাই। তখন আমি বললাম কীভাবে? তিনি তখন বললেন উনার মাসিক পারিশ্রমিক প্রায় ৩০লক্ষ টাকা। এ কথা শুনে আমার চোখ কপালে। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, উনার কাজ কী? তখন তিনি বললেন, প্লান্টের একটি ইউনিট পরিদর্শন করা। অতপর আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার পারিশ্রমিক কত? তিনি বললেন ১ লক্ষ টাকা। তখন আমি চিন্তা করলাম যদি আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা প্লান্টটি পরিচালনা করা যেত। তবে আমরা কতই উন্নতি লাভ করতাম। কিছু সময় পর আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেল। এবং আমরা আমাদের পারিশ্রমিক নিয়ে চলে আসলাম। আসার পথে পুরো রাস্তায়ই আমার মনটা খারাপ ছিল! আর মনে হচ্ছিল কেন আমরা আমাদের সম্পদগুলো নিজেরা পরিচালনা করতে পারছি না। আজ আমরা মালিক হয়েও নিজেকে মালিক হিসেবে প্রমাণ করতে পারছি না। এর জন্য আমাদের কী করতে হবে? স্বাভাবিকভাবেই উত্তরটা হবে, দক্ষতা অর্জন করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে "দক্ষতা ব্যতীত উন্নতি দূরাসাধ্য"। তাই দক্ষতা অর্জন করে নিজেকে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যাতে পরবর্তী প্রজন্ম আমাদেরকে স্মরণ করে।

জীবন সংগ্রাম

বিপ্লব দেব
আর্কিটেকচার ইনটেরিয়র ডিজাইন, ৩য় সেমিস্টার, ১ম শিফট

জীবনের গল্পটা খুবই ছোট। কিন্তু এই ছোট জীবনের পলার পথটা নানা ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ণ থাকে। চলতে চলতে অনেক সময় মনে হয় আর বুঝি এগুতে পারব না। কিন্তু তাও থেমে যাওয়ার কোন পথ খোলা থাকে না। তাই শত চরাই উৎরাই পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। মানব জীবনে চলার পথটা কতটা কঠিন হতে পারে তা আমি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অনুভব করতে পেরেছি। মানব জীবন মানেই সংগ্রাম। যারা নিজেদের এ সংগ্রামে টিকিয়ে রাখতে পারে তারাই জীবনে সফল হতে পারে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে অর্থাৎ জীবন পুষ্পশয্যা নয়। যারা এ সত্য জীবনের সকল ক্ষেত্রেতে স্মরণ রেখে কাজ করে যেতে পারে তারাই প্রকৃত অর্থে মানুষ। যারা শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবে তারা কখনো আদর্শ মানব হিসেবে পরিণত হতে পারে না। তারা আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকে খুব কম। বর্তমান যুগে এই জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য প্রথমেই জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে হয়। যে জাতি নিরক্ষর সে কখনো জীবন সংগ্রামে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। সকলকে জীবনে কখনো না কখনো বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। আর বিপদ কাটিয়ে উঠার জন্য চাই প্রবল মনোবল। এই মনোবল অন্য কেউ দিতে পারে না নিজেকেই অর্জন করতে হয়। আমাদের অনেক সময় মনে হয় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলে আমাদের পাশে আছে কিন্তু এটা ভুল ধারণা কারণ সকলেই সুখের পাশে থাকে বিপদের সময় পাশে থাকে না। সেই সংগ্রাম নিজেকে একাই লড়তে হয়, সাহস দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত কেউ থাকে না। তাই কখনো সম্পূর্ণরূপে কাউকে বিশ্বাস বা ভরসা করা উচিত নয়। নিজের উপর ভরসা রেখে জীবনে এগিয়ে চলা উচিত। কারণ, যাকে বেশি বিশ্বাস করা যাবে সেই একসময় ছেড়ে চলে যাবে। একসময় ভাবতাম বন্ধুদের সম্পর্ক কখনো ভাঙ্গে না কিন্তু এটা আমার ভুল ধারণা ছিল আজ বুঝতে পারি। তার কারণ যখন আমি জীবনে সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে তখন সবাই চলে গিয়েছিল পাশে কেউ থাকেনি। জীবন সংগ্রাম থেকে এটা বুঝতে পেরেছি কেউ কারো নয়। জীবন সংগ্রাম জয়ী হতে হলে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে সবার আগে। কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে উদ্দীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য। আমার স্বপ্ন আমি আমার দেশের জন্য কিছু করবো এটাই আমার সাধনা।

জীবনের গল্প যতই ছোট হউক না কেন সেখানে সুখ-দুঃখ দুটোই থাকবে। কখনো জীবনে আনন্দ বিরাজ করবে, কখনো বা দুঃখের ছায়ায় নিমজ্জিত হবে এ জীবন। কিন্তু তাও লক্ষ্যচ্যুত হওয়া যাবে না কারণ বিশ্বাস রাখতে হবে অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো একদিন দেখা দিবেই। কোনো পিছুটান জীবনকে থামিয়ে রাখতে পারে না। কোনো ব্যক্তি এই পৃথিবীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, কোনো কোনো অভাব সকলেরই জীবনে থাকে। আমার জীবনেও রয়েছে। তাই বলে থেমে নেই আমি। কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি অভিষ্ট্য লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। জানিনা কতদিন এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারবো। জীবনতো একটাই তাই জীবনকে স্বার্থক করতে হবে। সকলেরই উচিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য অবিরাম সাধনা করে যাওয়া। ছোট জীবনে বাঁকে বাঁকে কতজনের সাথে দেখা হয়। কিন্তু এ সকল মায়া মমতা পিছুটানকে পিছনে ফেলে জীবন সংগ্রামে চালিয়ে যাওয়া সহজ নয়। মানুষ কখনোই তার অতীতকে ভুলে যেতে পারে না তাই অতীতের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলতে হয়।

নিজেই নিজের অনুপ্রেরণা হতে হয়। সভ্যতার সাথে কাজ করতে হবে। কখনো জীবন যুদ্ধের ময়দানে পালিয়ে যাওয়া যাবে না, সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে আমরণ। কারো সমালোচনা না শুনে নিজের প্রতি বিশ্বাস রেখে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। জীবন সংগ্রাম অটল থাকতে হবে। জীবন সংগ্রামে নেমেছি তাই দেখবে জগৎটাকে। গরীব-ধনী সকলেই মানুষ। সকলে এক বিধাতার সৃষ্টি। সকলকেই ভালোবাসতে হবে। সকলকে আপন করে নিতে হবে। জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তাই তো বলি–

জীবন ও জগৎ
হলো একাকার
আমার এ সংগ্রাম
থামে না যে আর।
জীবন সংগ্রাম
চলে অবিরাম।

মাথা ব্যাথা

রনি দেব
কম্পিউটার ২য় শিফট। ১ম সেমিস্টার

১.

হাড় কাঁপানো শীতের মৌসুম, আর কিছু দিন পরেই এসএসসি পরীক্ষা। কিন্তু সেই পরীক্ষা আমার আর দেওয়া হবে না। কারণ হয়ত আর এক অথবা দুই সপ্তাহ সুখে -শান্তিতে এই পৃথিবীতে সবার সাথে বাঁচতে পারব। তারপরই সবাইকে ছেড়ে চিরকালের জন্য পরপারে পাড়ি জমাবো।

তোমরা হয়তো মনে করছ এসব আমি কী বলছি , আমি কী উন্মাদ হলাম নাকি ?

না, আমি উন্মাদ হইনি , যে টা সত্যি সেটাই বলছি। তাহলে চলো আসল ঘটনা খুলেই বলি ।

মাথা ব্যাথা! হঠাৎ এক রাতে আমার মাথায় প্রচন্ড ব্যাথা ওঠে। এর আগেও অনেকবার এরকম ব্যথা ওঠেছিল আবার কিছুক্ষণ পর সেরে ও গেয়ে ছিল। কিন্তু এবার অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থেকে ও যখন ব্যাথা কমলো না, তখন ব্যাথা সহ্য করতে না পেড়ে মা-বাবাকে ডাক দিলাম। তারা এসে আমার অবস্থা দেখে এক মহূর্তও দেরি না করে আমাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটলেন।

ঘন্টাখানেক পর হাসপাতালে পৌঁছে একটা কেবিনে আমাকে শুইয়ে দেওয়া হলো। এর অল্প কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এসে সাধারণ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নার্সকে একটা ইনজেকশন দিতে বললেন এবং আমাকে সিটিস্ক্যান করিয়ে আনতে বললেন। তারপর ডাক্তার চলে যাওয়ার পর নার্স আমাকে সিটিস্ক্যান রুমে নিয়ে গেলেন এবং গুহার মতো দেখতে একটা মেশিনের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। মিনিট পাঁচেক পর ওই মেশিন থেকে বের করে নিয়ে এসে কেবিনে শুইয়ে দিলেন। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পাইনি।

২.

সকাল গড়িয়ে প্রায় দুপুর হতে চলল। ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমার টেস্টের রিপোর্টগুলো চলে এসেছে। অনেকটাই ভালো অনভুত হচ্ছে, মাথায়ও আর ব্যাথা নেই। তাই বাবা মার সাথে রিপোর্টগুলো নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তার রিপোর্ট গুলো কিছুক্ষণ উল্টে পাল্টে দেখে আমাকে বাহিরে গিয়ে বসতে বললেন। তখনই সন্দেহ হলো হয়তো কঠিন কোন রোগ হয়েছে আমার। আর সেই জন্যই ডাক্তার আমাকে বাহিরে গিয়ে বসতে বললেন। কারণ অনেক বইয়ে পড়েছি আর নাটক-সিনেমাতে ও দেখেছি যে, রোগীর কঠিন কোন অসুখ হলে ডাক্তার রোগীর সামনে সেই কঠিন অসুখের ব্যাপারে কোন কিছু বলেন না। কারণ এতে র োগী মানসি ক ভাবে দর্বু র্বল হয়ে পড়ে । র োগীর মধ্যে মত্ ‍ু ভয় জে গে ওঠে , চি কি ৎসার আগে ই র োগী মানসি ক ভাবে ভে ঙে পড়ে যার ফলে র োগীর চি কি ৎসায় ব্যাঘাত ঘটে । তাই ডাক্তাররা সবসময় র োগীর আত্মীয়দে র সাথে কথা বলে ন, আর এখানে ও এটাই ঘটছে । তাই আমি রুম থে কে বে রি য়ে গে লাম। কি ন্তু রুমে র জানালা দি য়ে ভি তরে কী কথা হচ্ছে শুনছি । আমি বে রি য়ে যাওয়ার পর ডাক্তার অনে কক্ষণ মাথা নি চুকরে বসে রইলে ন। তারপর মাথা উঁচুকরে আমার মা-বাবার দি কে অসহায় দষ্টিষ্টিতে তাকি য়ে প্রশ্ন করলে ন, "আকাশ আপনাদে র ছে লে , তাই ত ো?"

ওহ্ দে খলে ন এতক্ষন ধরে কথা বলছি আর নি জে র পরি চয় টাই দি তে ভুলে গে ছি । যাইহ োক আমার নামই আকাশ, এবার দশম শ্রে ণীতে পড় াশ োনা করছি ।

তারপর্

ডাক্তারে র প্রশ্নে র জবাবে আমার মা-বাবা মাথা নাড় লে ন।

ডাক্তার আবার বলতে শুরু করল,"কী করে যে আপনাদে র বলি ".......

আবার শুরু করলে ন, "আপনাদে র ছে লে আকাশ ব্রে ইন ক্যান্সারে আক্রান্ত, পৃথি বীতে সে আর মাত্র কি ছুদি নে র অতি থি ।"

এ কথা শ োনা মাত্র মা ডুকরে কেঁ দে উঠলে ন, বাবাও চ োখে র পানি ধরে রাখতে পারলে ন না। ডাক্তার তখন তাদে র সান্ত্বনা দি ‡q বলল, "ছে লে র জন্য আপনাদে র শক্ত হতে হবে , কাঁদলে চলবে না আকাশে র সাথে স্বাভাবি ক ব্যবহার করতে হবে । যাতে বঝু তে পাড়ে না ও কঠিন ক োন অসুখে আক্রান্ত। যতদি ন বে চেঁচে থাকবে ওকে আনন্দ ফূর্তি তে রাখবে ন।"

এরপর ডাক্তারে র সাথে মা-বাবার আর কী কথা হয়ে ছে তা না শুনে ই বাহি রে র এসে একটা চে য়ারে বসে পড় লাম। কি ছুক্ষণ পর মা-বাবা হাসি মখুখে ডাক্তারে র রুম থে কে বে রি য়ে পড় লে ন। আমার কাছে এসে বললে ন, আমার কি ছুই হয়নি কি ছুঔষধ খে লে ই নাকি সুস্থ হয়ে যাব।

সন্ধ্যার দি কে বাড ি ফি রে এলাম। মা-বাবা তখনও হাসি মখেুখে আমার সাথে কথা বলে যাচ্ছি লে ন কি ন্তু জানি কষ্টে তাদে র বক্ু টা ফে টে যাচ্ছে । তবওু ডাক্তারে র কথা মতো আমাকে কি ছুবঝু তে দে ননি যাতে কষ্ট না পাই। মা-বাবা আসলে এরকমই হq নি জে র হাজার কষ্ট হলে ও সন্তানে র কষ্ট হতে দে য়না। তাই যে কয়টা দি ন বে চেঁচে আছি তাদে র আনন্দে রাখতে চাই। তাদে র কে ান কষ্ট দি তে চাই না। তাই আমি যে সব কি ছু জে নে ফে লে ছি সে টাও তাদে র বলি নি । কি ছুনা বলে আবার স্বাভাবি ক জীবনে ফি রে আসি । আগে র মত স্কুলে যাই, বন্ধুদে র সাথে আড্ডা দে ই, স্কুল শে ষে বাড ি ফি রে আসি এভাবে ই চলছে দি ন গুলো।

৩.

এভাবে ই কে টে গে ল বে শ কয়ে ক দি ন....

হঠাৎ একদি ন মা কাঁদতে কাঁদতে আমার রুমে এসে আমাকে জড ি য়ে ধরে আরো জো রে কাঁদতে লাগলে ন। কী হয়ে ছে জানতে চাইলে তি নি বলে ন, কি ছুদি ন আগে আমাকে যে ডাক্তারে র কাছে নি য়ে যাওয়া হয়ে ছি ল, তি নি নাকি আমার রি পো র্ট গুলো দে খে বলে ছি লে ন যে আমার ব্রে ইন ক্যান্সার হয়ে ছে । আমি আর বে শী দি ন বাঁচবো না। কি ন্তু আজকে ডাক্তার নি জে ফো নে করে ভুল শি কার বলে ছে সে ই রি পো র্ট টা নাকি আমার ছি ল না আরে ক টা ছে লে র ছি ল তার নাম ও নাকি আকাশ তাই ভুল হ‡q গি য়ে ছি ল। ভুল ভাঙলো যখন ওই ছে লে টা আবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো।

এইটুকু বলে ই মা আমাকে আঁকড ে ধরে কাঁদতে ই থাকলে ন।

গল্পের শিক্ষাঃ কখনো হতাশ হওয়া ঠিক নয়, তা মতৃ ু নি শ্চি ত জে নে ও হতাশ হওয়া ঠিক নয়। কারণ এই পৃথি বীতে কে উই অমর নয় সবাইকে ই মতৃ ুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে । তাই অযথা মতৃ ুকে ভয় পে য়ে মানসি ক ভাবে ভে ঙে পড া যাবে না। আকাশ যে মন তার মতৃ ুর কথা জানতে পে রে ও বি চলি ত না হয়ে স্বাভাবি ক জীবন যাপন করে গে ছে তে মনি আমাদে র ও যদি কখনো এমন পরি স্থি তি র সম্মু খীন হতে হয় তখন আমরা বি চলি ত না হয়ে স্বাভাবি ক জীবন যাপন করতে হবে ।

দীর্ঘশ্বাস

শেখ সাইম
সিএমটি, ৩য় সেমিস্টার, ১ম শিফট

জে.এস.সি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল পেয়ে উর্ত্তীণ হবার পর আব্বা বললেন আমি যেন কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করি। আব্বার কথামত হবিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে ভর্তি হলাম। সেখান থেকেই কারিগরি শিক্ষাজীবন শুরু। যখন হবিগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে পড়তাম তখন খুবই ইচ্ছে ছিল হবিগঞ্জ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে পড়ার। এই তীব্র ইচ্ছা নিয়ে এস.এস.সি পরীক্ষা দিলাম ফলাফলও ভালো। আমার ইচ্ছে ছিল হবিগঞ্জ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে কম্পিউটার টেকনোলজীতে মর্নিং শিফটে পড়ার। সে অনুযায়ী আবেদন, প্রথম পছন্দ হবিগঞ্জ টেকনিক্যাল ইনস্টিউটট দিয়েছি। চিন্তা হচ্ছিল যদি হবিগঞ্জ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তির সুযোগ না পাই তাহলে হবিগঞ্জের বাহিরে গিয়ে পড়তে হবে তাই বিকল্প হিসেবে বৃন্দাবন সরকারি কলেজেও আবেদন করলাম। কারিগরি এবং সাধারণ শিক্ষা বোর্ড সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ায় দুইটি আবেদন করতে হয়েছে। আমি বৃন্দাবন সরকারি কলেজে মানবিক শাখায় ভর্তির সুযোগ পেয়েছি আর হবিগঞ্জ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে অপেক্ষামান তালিকায়। তখন অনেকটা ভেঙ্গে পরে-ছিলাম, ভাবছিলাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে পড়ার তীব্র ইচ্ছেটা আর হয়তো পূরণ হবে না। তবুও যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। এদিকে আমার পরিবার থেকে চাপ দিচ্ছিলেন বৃন্দাবন সরকারি কলেজে ভর্তি হবার জন্য। কিন্তু আমি বলেছিলাম পলিটেকনিক ছাড়া পড়েই বা কি লাভ? মাস্টার্স পাশ করেও কি ঘুষ ছাড়া কোনো চাকরি পাব? চাকরি না পেয়ে বেকারত্ব নিয়ে ঘুরাঘুরি ছাড়া আর কি-ইবা করতে পারব? অন্যদিকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে পড়লে চাকরি না পেলেও আত্মকর্মসংস্থান দিয়ে আরও মানুষকে চাকরি দিতে পারব। শেষ পর্যন্ত আমি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম। কয়েকদিন পরেই অপেক্ষামান তালিকার ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। এবার আমি ভর্তির সুযোগ পেয়েছি। ভর্তি হয়েছি। মনের মধ্যে তৃপ্তি পেলাম একটা তীব্র ইচ্ছা পুরণ হয়েছে। প্রথমদিন কলেজে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল ভর্তি হবার জন্য তখন কলেজের পরিবেশ দেখে আমি মুগ্ধ। করোনা ভাইরাসের কারণে তখন লকডাউন চলছে তাই ক্লাস শুরু হয়েছে অনলাইনে। অনলাইন ক্লাসে সহপাঠীদের সাথে মোটামুটি পরিচয় হয়েছে। লকডাউন যখন শেষ হলো তখন থেকে স্ব-শরীরে কলেজে গিয়ে ক্লাস শুরু। কলেজের প্রথম দিনটা আমার কাছে অনেক আনন্দময় ছিল। নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচয়, একেক জনের আবার একেক রকম আঞ্চলিক ভাষা। কলেজ খোলার আগে অনলাইন ক্লাস হতো আমরা প্রায় সবাই-ই করতাম। ছেলেরা অনলাইনক্লাসে নিজের ছবি দিয়ে প্রোফাইল দিতো বলে ছেলে অনেককেই চিনতে পারলাম। মেয়েরা কেউ-ই প্রোফাইলে নিজের ছবি দিতো না তাই একটা মেয়েকেও চিনতে পারলাম না। অবশ্য আমাকে সবাই চিনেতো কারণ অনলাইন ক্লাসেআমি বেশিই কথা বলতাম। আমার পাশেই একটা মেয়ে তার বান্ধবীকে আমাকে দেখিয়ে বলতেছে, "এই দেখ এটাই শেষ সিয়াম। আমি এমন ভাব করলাম যেন আমি কিছুই শুনিনি। মেয়ে বলে কথা একটু ভাবসাব নেওয়ার ব্যাপার আর কি! কলেজে আমি সবার সাথেই কথা বলতাম এজন্য অল্প কিছুদিনেই বন্ধু পেয়ে গেছি অনেকগুলো। কলেজ জীবনের বন্ধুত্বগুলো আসলেই অসাধারণ। আমার কাছে মনে হয় এ যেন দ্বিতীয় পরিবার। কিছুদিন কাটতেই সিনিয়র বড় ভাইয়েরা কথা তুললেন শিক্ষাসফর নিয়ে, আমি ভ্রমণপ্রিয় মানুষ সফরে আমার আগ্রহ সবসময়ই প্রবল। শিক্ষা সফরে যাবার জন্য সবার মতামতের ভিত্তিতে জায়গা নির্ধারণ করা হলো "সাফারি পার্ক", গাজীপুর, ঢাকা। ২৫ অক্টোবর ২০২১ দিনটা ছিল সোমবার। বাসে সবার সাথে মজা করতে করতে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। সেদিনই স্যার-ম্যামদের সাথে এতো কাছ থেকে মিশতে পারা। সেখানে গিয়ে সবার সাথে বসে দুপুরের খাবার খেলাম। তারপর দল বেধে প্রবেশ করলাম পার্কে। রবিন, বাসার, বদরুল, মাসুদ, ফায়াজ, মিনহাজ, সুব্রত এদের নিয়ে আমাদের দল। পার্কে ঘোরাঘুরি করে দেখলাম অনেক কিছুই, জানতেও পারলাম অনেক অজানা জিনিস। পার্কের প্রধান আকর্ষণ ছিল বাঘ আর সিংহ। বাসে করে বনের গভীরে গেলাম বাঘ আর সিংহ দেখতে। বাঘ সিংহ এর আগে আমার কখনো দেখা হয়নি। প্রথমবারের মত সিংহ দেখে আমার গায়ের লোম নাড়া দিয়ে উঠল। বাঘ মামার দেখা পেলাম না। পার্কে নানারকম অদ্ভুত মজাদার জিনিস দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, এবার পালা বাড়ি ফেরার। "সাফারি পার্কের' নানারকম অবিস্মরণীয় স্মৃতি নিয়ে বাড়ি ফিরলাম রাত একটার দিকে।

প্রথম সেমিস্টার কাটিয়ে দিলাম আনন্দ উল্লাসে। দ্বিতীয় সেমিস্টার শুরু করলাম খুবই মনোযোগী ছাত্র হয়ে। পড়ালেখা চলছিলো ভালোই। হঠাৎ পরিবার থেকে প্রস্তাব এলো বিদেশে যাওয়ার। আমার পরিবার থেকে এরকম কোনো প্রস্তাব আসবে আমি কখনো কল্পনাও করিনি। বাবা-মার বাধ্য সন্তান হিসেবে রাজি হয়ে গেলাম কোনো প্রশ্ন ছাড়াই। বিদেশে যাবার ভিসা প্রসেসিং চলছে। তখন দ্বিতীয় পর্বের সমাপনী পরীক্ষা। জানি পড়ালেখার ইতি হয়ে গেছে। তবুও প্রতিষ্ঠানের মায়া, স্যার ম্যামদের মায়া, বন্ধু-বান্ধবের মায়া ছাড়তে পারিনি আমি। তাই মিছে মিছেই দ্বিতীয় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় পর্ব সমাপনী পরীক্ষার শেষ পরীক্ষার দিনটা ছিল আমার ছাত্রজীবনের শেষ দিন। কাউকেই বলতে পারলাম না আর হবে না দেখা সকাল সকাল, আর আসতে পারব না রোজ রোজ প্রিয় ক্যাম্পাসে। নিজেকে তখন চোরের মতো লাগছিল মনে হচ্ছিল নিজেকে নিজেই চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি সবার থেকে। নিস্তব্ধ কান্না বুকে চেয়ে ধরে বেড়িয়ে আসছিলাম ইনস্টিটিউট থেকে। শেষবারের মতো ইনস্টিটিউটের দিকে যখন তাকালাম তখন কোনো ভাবেই ধরে রাখতে পারিনি চোখের পানি। তখন এক দীর্ঘশ্বাসের সাথে ছাড়তে হয়েছিল আমার প্রিয়তম হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। এক দীর্ঘশ্বাসেই আমার ছাত্রজীবন আজ স্মৃতি।

সেক্রিফাইস

মরম চাঁন হানিফ তালুকদার জামি

ডিপার্টমেন্ট : সিভিল-৩/২

⊙ মাহি আর আবিরের রিলেশন ২ বছর হয়েছিল। মাহি যখন ইন্টার ১ম বর্ষেও পড়তো আবির তখন ইন্টার ২য় বর্ষে। মাহিকে দেখেই আবিরের ভালো লাগে আর প্রপোজ করে। মাহিও রাজি হয়ে যায়। এভাবে কখন যে স্বপ্নের মতো ২টা বছর পেরিয়ে গেল বুজতেই পারিনি।

২ দিন আগের ঘটনা –

কলেজ থেকে বাড়িতে আসতেই মাহির মা মাহিকে বলে –

মা (মাহির মা) : আজ বিকেলে প্রাইভেট যেতে হবে না। ছেলে পক্ষ তোকে দেখতে আসবে। খাওয়াদাওয়া করে পাশের রুমে যা সেখানে অবন্তি/জামি বসে আছে। সে তোকে রেডি করিয়ে দিবে।

≠ মায়ের কথা শুনে আকাশ ভেঙ্গে পড়ে মাহির মাথায়। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না মাহি। আবিরকে যে ফোন দিয়ে বলবে এই ব্যবস্থাও নেই। কারন বাসায় আসতেই মাহির হাত থেকে ফোন নিয়ে নেয় মাহির মা।

তাই এই পর্যায়ে অবাধ্য আর অনিচ্ছাকৃত ভাবে খাওয়াদাওয়া করে রেডি হয়ে আসতে ছেলের পক্ষের সামনে।

আর ছেলের পক্ষের মাহিকে দেখে পছন্দ হয়ে যায়। আর বিয়ের তারিখও ঠিক করে ফেলে। ছেলে পক্ষ চলে যেতেই মাহির বাবা-মা কে মাহি বলে –

আমি এই বিয়ে করতে পারবো না। আমি একজনকে ভালবাসি। বিয়ে করলে আমি তাকেই করব।

তখন মাহির বাবা-মা মাহিকে কাছে এনে চুমু দিয়ে বলেন –

মা আমরা কখনোই তর খারাপ চাইনি। এই ছেলে ব্যাংককে চাকরী করে ।

বাবা :- তুমি (মাহি) যাকে ভালবাস। সেই ছেলে যদি এই ছেলে থেকে ভাল হয় তাকে মেনে নিতে আমাদের কোনো আমাদের কোনো আপত্তি নেই ।

বল সেই ছেলে কী করে ?

মাহি :- বাবার কথা শুনে মূর্তির মতো চুপ হয়ে দাড়িয়ে রইলো মাহি। তার কাছে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না মাহির কাছে। কারন আবির মাত্র ইন্টার পরীক্ষা দিয়েছে । তাই কোনো কথা না বললেও দৌড়ে নিজের রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানায় পড়ে কান্না শুরু করে দেয় মাহি। কি করবে কিছুই বুঝতে পারছিলো না মাহি। এক পর্যায়ে মাহি ঠিক করে সে বিয়ে করবে না। আর সে আবিরকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। হ্যা এটাই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। এটাই চিন্তা করতে করতে কখন যে রাত ৯ টা হয়ে গেল বুঝেনি মাহি। হঠাৎ রুমের বাহিওে দরজায় নক করে মাহির মা। নক করতেই দরজা খুলে দেয় মাহি। মা ভিতরে ডুকে দেখেন মাহির চোখ মুখ কান্নায় ফুলে রয়েছে।

মা :- দেখ মা আমরা তোকে জন্ম দিয়েছি ছোট থেকে অনেক আদর ভালবাসা দিয়ে আস্তে আস্তে বড় করেছি। এই সময়ের মাঝে কি তোর কাছে আমি বা তোর বাবা কিছু চেয়েছি ? প্রত্যেক বাবা মায়ের স্বপ্ন থাকে নিজের সন্তানকে একটা ভালো জায়গায় বিয়ে দিতে। আমাদের আর কোনো সন্তান নেই। তাই আমাদের যতো আশা একমাত্র তোকে নিয়েই। তুমি যদি আমাদের সেই আশা আর স্বপ্নটা ভেঙ্গে দিস তাহলে আমি আর তোর বাবা আর এই দুনিয়াতেই থাকবো না সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন আমাদের বাচাঁ-মরা তোর হাতে। এই কথা বলেই মাহির মা মাহির রুম থেকে চলে যায়। মাহি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। মুখ থেকে কোনো কথাই বের হচ্ছে না মাহির। আর চোখ দিয়ে অঝর পানি পড়ছে। তার পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তার মা এসে সেটাও চিড়দিনের জন্য বন্ধ করে দিল।

অন্যদিকে আবিরও তাকে প্রচন্ড ভালবাসে। বিয়ের কথা আবির শুনলেও বাঁচবে না। কী করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না মাহি।

অবশেষে মাহি ঠিক করল, আমি যদি আবিরকে বলি আমি তোমাকে ভালবাসি এবং আমি তোমাকেই বিয়ে করতে চাই কিন্তু এই এই কারণে পারবো না। তাহলে আবির সুইসাইড করবে। তাই মাহি ঠিক করে আমাকে যেভাবেই হোক আবিরের কাছে নিজেকে খারাপ প্রমাণ করতে হবে। তাহলে আমাকে খারাপ মনে করে ভুলে যাবে। আর আবিরের মন থেকে আমার প্রতি ভালবাসাও চলে যাবে।

তাই মাহি সিদ্ধান্ত নেয় পরের দিন কলেজে গিয়ে মাহি আবিরকে বলে দিবে আমি আর তোমাকে ভালবাসি না আমি অন্য একজনকে ভালবাসতাম আমি তাকেই বিয়ে করতেছি। মাহি মনের মধ্যে আকাশ সমান কষ্ঠ নিয়ে এটাই ঠিক করে। আর বিছানায় পড়ে বাচ্চাদের মতো হাউমাউ করে কাদঁতে লাগল।

পরের দিন মাহি কলেজে গিয়ে আবিরের সামনে দাঁড়ায়। আর মাহি মনের মাঝে আকাশ চাপা কষ্ঠ নিয়ে আবিরকে বলে –

মাহি :- আবির আমি অন্য একজনকে ভালবাসতাম আর আমার ফ্যামিলি আমার বিয়ে তার সাথে ঠিক করেছে। তাই তোমার সাথে আর রিলেশন রাখতে পারব না।

মাহির গালে জোরে থাপ্পর দিল আবির আর বলল

আবির :- তুই আমার সাথে এমন করবি আমি ভাবতে পারি নি। আমার সাথে কেন এমন করলি এই মিথ্যা প্রেমের অভিনয় ? কি দোষ করেছিলাম আমি। আরে তোদের মত চরিত্রহীনদের জন্যই আজ প্রেমের নামে এত বদনাম। তুই এতোটা খারাপ আমি আগে ভাবতেই পারিনি। যা আর কখনো আমার সামনে পরবি না।

আবিরের কথাগুলো শুনে মাহি নিচের দিকে তাকিয়ে মনের মাঝে কষ্ঠগুলো লুকিয়ে অঝরে চোখ দিয়ে পানি ঝরছিলো। আর কোনো কথার উত্তর দিচ্ছে না। চুপ-চাপ নিজের স্বপ্নগুলোকে মাটি চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাহি বাড়ি চলে আসে।

≠ আমাদের সমাজে এরকম হাজারো মাহি আছে। যারা নিজের স্বপ্ন,আশা,ভালবাসা সেক্রিফাইস করে একমাত্র পরিবারের জন্য। তারা মা-বাবার কথা রাখতে গিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বলিপান দিয়ে মা-বাবার ইচ্ছাকেই নিজের বানিয়ে নেয়। আর এরকম মাহিরা নিজের খারাপ হয়েও সবসময় চায় যাতে ভালবাসার মানুষগুলো ভাল থাকে। তারা সেক্রিফাইস করতে করতে কাটিয়ে দেয় তাদের জীবন। তবুও সেক্রিফাইস শেষ হয় না। একটার পর একটা আসতেই থাকে।

দিনশেষে এই মাহিদের একটাই কথা ভালো থাকুক কাছের মানুষগুলো।

কবিতা

অজস্র তারা

শাহ্ ফাইরোজ নূরীম শশী
লেখক : সিএমটি (৭/২)

অজস্র তারা মাঝে একটি যে শশী
অমানিশায় পূর্ণ প্রভাত হয়ে নিশী

সে শশী পৃথিবীর এক অপূর্ব অনুকম্পা
তাই শশী বিনে রাতে মিটে না আকাঙ্ক্ষা

কামিনী সাজে যেমন লাগে অলংকার
শশীর সাজ হিসেবে তারা সংসার

শাড়ীতে মানায় যেমন মানায় সুন্দরী মেয়েরা
মিটমিট তারা শশীকে দেয় পাহাড়া

শুধু শুধু দূর থেকে শশী করবে ইশারা
ভেবে চিন্তে তার ডাকে দিতে হবে সাড়া।

খোয়াই নদীর তীরে

মলয় চৌধুরী
হিসাবরক্ষক

ঝরে ঝরে যায় পাতা---
হেমন্তের গন্ধ পায়ে মেখে।
কুয়াশার রক্ত শুষে নেয় মাটি
তবুও জীবন কিছু তো শেখে।
কত বছর গেছে পেরিয়ে
জীর্ণ শরীরে উজ্জ্বল দুটি আঁখি।
আমি একাকী প্রেমের গন্ধ পায়ে মেখে
নিত্য অপেক্ষায় থাকি।
কলমির লতা আপন খেয়ালে
বেগনে ফুলে বেঁধেছে তার বেণী
ক্ষুধার্ত ফিঙে তাকিয়ে থাকে সেথা
কেউ তো তার খবর রাখেনি।
কত প্রেম অকালে মরে
কত প্রেম যায় হারিয়ে
কেউ তো ভাবে না তার কথা
কেউ তো দেয় না হাত বাড়িয়ে।
গোধূলির সিঁদুর তোমার সিঁথিতে
চৈত্রের ঢলে পড়া রাঙা রবি ঐ ভালে।
ভেবেছিলাম একদিন দেবো তোমায়
তাতো পারিনি কোনো কালে।
জানি আবার হবে দেখা
যদি কখনো আসি ফিরে।
অপেক্ষা হবে শেষ খোয়াই নদীর তীরে
ঘরের মধ্যে ঘর বাঁধবো তোমাকে ঘিরে।

প্রকৃতি প্রেম

হাসনা আক্তার রুমা
কম্পিউটার (৩/২য়)

শিশির ভেজা কোমল হাওয়া
নরম ঘাসের আলতো ছোয়া
মিষ্টি রোদের নরম আলো
আঁখি মেলে দেখবে চলো
প্রকৃতি তুমি বড়ই অদ্ভুত
ক্ষণিকে পাল্টায় তোমার রূপ
কখনও বৃষ্টি, কখনও রোদ
দেখাও তোমার নানান রূপ
সবুজ পাতার বৃষ্টি ফোঁটা
দেখতে লাগছে দারুন মজা
কিছুটা পশলা মেঘ
রাগ করেছে খুব
আজ মন খুলে দেখ কাঁদছে
প্রকৃতি তুমি বড়ই ভাবাও
কখনও হাসাও, কখনও কাঁদাও

রাত্রি যখন গুমোট বাঁধে
মস্তিষ্কে তখন স্বপ্ন রাধে
সূর্য যখন প্রকট হাসি দেয়
জীবন তখন জীবিকার সাধ নেয়
প্রাণ যখন ক্লান্তি গুচাতে চায়
বিকালের মৃদু হাওয়া প্রশান্তি খুঁজে পায়
প্রকৃতি তুমি ভেজায় দুষ্ট
তোমার মাঝে লুকিয়ে রাখ
হাজারো দেওয়া কষ্ট
তুমি ত রূপ পাল্টাও ঋতুর আবর্তনে
তাইতো আমি লিখেছি
প্রকৃত প্রেমে।

৪৭ থেকে ৭১

মোঃ রাহাত হোসেন
কম্পিউটার (সে.৩য়/শি. ১ম)

৪৭ এ শুরু আর ৭১ এ শেষ
২৪ বছর শোষণের পর
অবশেষে জন্ম হলো
নতুন রাষ্ট্র সোনার বাংলাদেশ।
ভাষা আন্দোলনে শুরু আর
মুক্তিযুদ্ধে শেষ
নতুন দেশের জন্ম হলো
সোনার বাংলাদেশ।
কত মানুষ প্রাণ দিলো
কত মানুষ হারালো স্বজন
সবশেষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে
জিতে গেল বাংলার মানুষজন।

স্বাধীনতার গান

মোছাঃ সাদিয়া আক্তার
সিএমটি/(৩/১)

বাংলা আমার মা, বাংলা আমার প্রাণ
রক্ত দিয়ে লেখা বাংলার জয়গান,
যে গান লেখেছিল, ৭১ এর বাংলার বীর সন্তান
যে গানের জন্য দিয়েছিল মা-বোন ইজ্জতের বলিদান।

৭ই মার্চ বিকেল বেলা লাখো জনতার মাঝে
এলেন জাতির পিতা শেখ মুজিব শিল্পের সাজে
শুনালেন তার অমর কবিতার কলি
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"
অগ্নিঝড়া সেই গানে রক্ত দিল ত্রিশ লক্ষ প্রান
যাদের নিয়ে লেখা হল স্বাধীনতার গান।
৭১-এ বাংলার বুকে জন্ম নেয় আরেক নদী
যার নাম রক্ত নদী! যার নাম রক্ত নদী!
এক নদী রক্ত দিয়ে রাখা হল বাংলা মাটির মান
ইতিহাসে এই নিয়ে লেখা হল স্বাধীনতার গান।

বৃক্ষের কথা

ইবনে শাইখ
এআইডিটি (৩/১)

বৃক্ষ আমি বৃক্ষ আমি
জীবন আছে মোর,
তবুও তো ভাই পাইনা আমি
ছোট্ট একটা ঘর।
আমার দ্বারা চলে প্রশ্বাস
গোটা মানব জাতির
তবুও এরা স্বার্থের জন্য
করে আমায় কাতিল।
এ মানুষেরা ভাবল না তো
আমার উপকার
করেই গেল আমার সাথে
শুধুই অপকার।
বৃক্ষ আমি এই কি দোষ
দেই অন্ন-ছায়া
তবুও তো করিস নে মোরে
একটুখানি মায়া।
সবাই যদি করেন ভাই
একটি বৃক্ষরোপন,
ছেড়ে দেবো সব দাবি
এই রইল পণ।

আসমান

নুরুন্নাহার উর্মি
সিএমটি (বি) ৩/১

আসমানের রহস্য কভু শেষ হবার নয়
ইহা কল্পনাময়ী-
কখনো মেঘ হয়ে,
কখনো বা মিষ্টি রোধের হাসি
শীতলকুঞ্জের মতো মায়ায় আটকে যাবে কেউ
আসমানের দৃশ্যমান রূপ কভু শেষ হবার নয়
ইহা বিশালতার সীমাহীন মায়াবী আসমানপুরী
একই পানে এত রূপ কোথাও দেখি নাই
তোমার পানে তাকিয়ে থাকলে অশ্রু তৃপ্তি পায়।
তোমার পানে তাকিয়ে সাত রং খুঁজে পাই।
তুমি অসীম, তুমি বিশাল।

জীবন কথা

প্রযক্তা বণিক (অদিতি)
সিভিল (১ম/১ম)

মৃত্যু যখন ডাকলো আমায়
আয়লো কাছে আয়।
তখন আমি বলছি হেথায়-
তোমার অপেক্ষাই করছ আমি
আর ভাবছি...
আসবে কখন তুমি?
তবে কী বন্ধু এলে তুমি,
আমার মুক্ত করবে বলে–
নিয়ে তবে যাবে আমায়,
করে সেই অজানা অপেক্ষার অন্ত।
না-না-না
শেষ আছে তারই শুধু
আছে যার শুরু।
কেমন করে হবে তোমার শেষ?
হয়নি যখনও শুরু।
করবে বরণ জীবন যখন-
হবে শুরু তোমার তখন।
জন্ম হবে মৃত্যু হবেক
কাঁদবে তুমি হাসবে তুমি
স্বপ্নও তেমনই ডানা মেলবে–
পাখিল মতো উড়বে তুমি,
স্বপ্নের ডানা জোড়া ধরে।
জন্ম তোমার হলো যেমন মৃত্যু হবে তেমন
শেষ যদিও বা হলো তোমার
স্বপ্ন খানি রয়ে গেল।

অভিলাষ

প্রসেনজিৎ সাহা প্রান্ত
সিভিল (পর্ব-৩য়/শি/১ম)

এক বুক জ্বালা নিয়ে চলছি স্বদেশে
শত জঞ্জাল, শত অনিয়ম
তবুও মন থেমে নেই, আশা এই বুকে
একদিন আসবে, আসবে সুদিন এই দেশে।
কর্মক্ষেত্রে সদা দেখি কর্মহীনের আস্ফালন
মসনাদে বসে আছে সব
কর্মবিমুখ অকর্মের দল।
আশায় বুক বেঁধে আছি
সেদিন বেশি দূরে নয়,
জেগে উঠবে, উঠবে স্বদেশ সহসাই।
চারদিকে চলছে শুধু বাকপটুর প্রতিযোগ
ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা করতেই সবার মহাঝোঁক
অপশিক্ষায় শিক্ষাক্ষেত্র,
এটাই এখন স্বাভাবিক
সুশিক্ষায় মানুষগুলো করছে সবাই হাপিত্যেস
তবুও ভাই আশা এই মনে-
সুশিক্ষায় আলোকিত মানুষ জাগবেই অল্পক্ষণে।
তারা জাগাবে মন, জাগাবে মানুষ
জাগাবে সমাজ, জাগাবে দেশ,
সুশিক্ষার পদাঘাতে ওরা
অপশিক্ষা করবে শেষ।
হে আমার বাংলা মায়ের দামাল তরুন
বাংলার যুব সন্তান-
তোমরাই দেখাবে আলোর ঝিলিক
আনবে ফিরিয়ে দেশ মাতার সম্মান।

ক্যাপ্টেন

সাদিয়া জাহান
সিটি (৭/১)

ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব বোঝা
নয় কিন্তু এত সোজা
থাকে যদি অভিজ্ঞতা
এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা
সেই একমাত্র সফল হয়
পথ আটকাতে পারবেনা তার
শত বাধা-কিংবা ভয়
ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব সবখানে
সকলেই সেটা মানে
গুরুত্বটা সে বুঝে নিয়ে
দু-এক কদম চলতে গিয়ে
হোঁচট খেয়ে বারে বারে।

পিছনে যদি না আসে ফিরে
সেই করবে জয়
পথ আটকাতে পারবে না তার
শত বাধা কিংবা ভয়
ক্যাপ্টেন যদি থাকে সজাগ
ভয় কিংবা দুর্বিপাক
পারে না যাকে করতে কাবু
খায়না সে হাবুডুবু
লক্ষ্যে সে স্থির থেকে
চালায় যদি অভিযান
পথ আটকাতে পারবে না তার
শত কঠিন বজ্রবান।

ছোটাছুটি

সাদিয়া জাহান
সিটি (৭/১)

ছোটাছুটির ঘূর্ণিপাকে
কার জীবন কোন বাঁকে
ছুটছে শুধু অবিরাম
লোভের পিছে ছুটে ছুটে
দুনিয়াটা লুটেপুটে
ফেলছে তারা মাথার ঘাম।
নেশার ঘোরে ছুটতে গিয়ে
মনুষ্যত্বকে বিলিয়ে দিয়ে
দিব্যি যারা চলছে ছুটে
লোভের নেশায় অন্ধ তারা
চোখ থেকেও দৃষ্টিহারা
ধ্বংস তাদের সন্নিকটে
ছোটাছুটির ঘূর্ণিপাকে
বিবেক, বুদ্ধি, সম্মানটিকে
রেখেছে কালো মুখোশে ঢাকা

পচন ধরেছে রক্তে মাংসে
তবুও তারা গিলছে গ্রাসে
রাশি রাশি কালো টাকা
ছুটতে ছুটতে পা মচকে
শিড়দাড়াটা একটু বেঁকে
দাঁড়াতে যখন যায়
ঠিক তখনি চাপা পড়ে
গড়ে তোলা টাকার পাহাড়ে
জীবনটাও হারা।

বাংলা আমার মাতৃভাষা

মোছাঃ রনি আক্তার রুমি
সিএমটি (সে.৩/শি.১)

বাংলা মোদের মাতৃভাষা, বাংলা মোদের প্রাণ,
জীবন দিয়ে রাখব মোরা পতাকার সম্মান।
বাংলা ভাষা নইকো সে যে সোনার চেয়েও দামি,
বাংলা ভাষায় কথা বলে ধন্য হলাম আমি।
বাংলা ভাষায় কথা বলে মনে শান্তি পাই
যেন মনে হয় অন্য ভাষায় এমন শান্তি
নাই।
লালনগীতি, লোকগীতি যতই আমি গাই,
বাংলা ভাষার মায়ার স্পর্শ যেন খুঁজে পাই।
আমি যে পাগল বাংলা মায়ের বাংলা গানের সুরে,
যেন মনে হয় আমি আমার নয়,
হারিয়ে গেছি অনেক দূরে।

মোদের প্রতিষ্ঠান

জেরিন খান
সিভিল (৭/১ম)

মাথা উঁচু করে
শত শত মানুষের ভিড়ে
দাঁড়িয়ে আছে মোদের প্রতিষ্ঠান
কারিগরী শিক্ষায় আলোকিত কার তরে।
মোদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
হয়ে সে মহান
হৃদয়ে জাগায় ঊষার আলো
দূর করে সে আশে পাশের শত কালো।
আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
বয়ে আনে কত জ্ঞানী-গুনী
কত অজানাকে জানি মোরা
গ্রহণ করে তাদের বাণী

স্বাধীনতা তুমি

কলসুমা আক্তার
সিভিল (পর্ব-৭/১)

স্বাধীনতা তুমি।
আমাকে করেছ কবি
দিয়েছ হাতে তুলে লাল কলম
শুনেছি বাংলার বুকে অনেক রক্ত ঝড়েছে।
তাইতো আজো কুমারী নারীর বুকে বেদনা বইছে।
সহস্র মায়ের চোখের জল মিশেছে বন্যা কবলে!
বিনিময়ে আমাদের দিয়ে গেলে একটি শাপলা।
হে স্বাধীনতা,
তোমাকে নিয়ে সবাইতো লিখে
আমি আর নতুন করে কি লিখবো
বিদায়ক্ষণে এইটুকু অনুরোধ জানাবো
বাংলার বুকে তুমি চির অক্ষয় থেকো।

স্বপ্ন

মোঃ জসিম মিয়া
সিভিল (পর্ব ৭/১)

স্বপ্ন আমার আকাশ ছোঁয়া
দেখি যা দিনে রাতে
হতে হবে সফল মানুষ
স্বপ্নীল এই পৃথিবীতে।

প্রতি কালেই পরিশ্রম করি
পরিশ্রমে মিলে বড় কিছু করার সুযোগ,
হতে হবে দক্ষ প্রকৌশলী
তাই পড়ালেখায় এতো মনোযোগ।

জানি না হতে পারব কি-না
সেই কাঙ্ক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার,
সাহায্য চাই সেই পালনকর্তার
দোয়া চাই সবার।

নারী

শ্রেয়া দাস তমা
সিভিল (পর্ব ৭/১)

তুমি নারী
তুমি হৃদয়ের স্পন্দন,
তুমি হাজারো লক্ষ সন্তানের সম্মান
তোমার গর্ভে বেড়ে ওঠা প্রজন্ম।
তুমি মাঝে রাতে সন্তানের আর্তচিৎকারে
ভেঙ্গে যাওয়া ঘুম।
তুমি ভাইয়ের কষ্টে
দুচোখ বেয়ে পড়া
এক ফোঁটা জলের ফুল।
তুমি অন্ধ-বিশ্বাসে
অচেনা ছায়ায় ধরো তাহার হাত।
নিজের ঘর ছেড়ে সব কিছু ভুলে
কাটে ঘুমহীন রাত
নারী তুম কি জানো
তুমি সৃষ্টির কারণ?
তুবও তোমার জন্য সব আইন
বাঁধা আর বারণ।
নারী তুমি হও শক্তি
বেঁচে থাকার স্বপ্ন।
নারী তুমি হও স্পৃহা
নারী হোক মুক্ত

সোনার বাংলাদেশ

মোঃ নাইজুর রহমান নাঈম
সিভিল (পর্ব ৭/১)

ধন্য আমার জন্ম ভূমি
পুণ্য বাংলাদেশ।
শুভ শান্তির উদ্ভাবনে,
স্নিগ্ধ পরিবেশ।
মাটির মায়ায় শীতল ছায়ায়
জুড়ায় সদা প্রাণ।
গাছে গাছে গাইছে সদা,
লক্ষ পাখির গান।
নদীর জলে বিলে ঝিলে
মিষ্টি পানির বান।
সুধামৃত যায় বিলিয়ে
হয় না কভু শেষ
শান্তি সুখের পূর্ণ আধার
সোনার বাংলাদেশ।

বোকা

মরম চাঁন হানিফ (জামি)
সিভিল (পর্ব ৭/২)

এই বোকা! মন খারাপ কেন শুনি?
একা একা বসে আছো
মুখখানি গোমড়া করে,
আঁধারে মুখখানি লুকিয়ে কাঁদলেই বুঝি
কেউ বুঝাবে না তাই-না !!!
এই বোকা! মন খুলে হাসো একটু
চোখের পানির বন্যা মুছো একটু
দেখ না জোনাকিরা অপেক্ষায়,,,
তোমার প্রতীক্ষায় আকাশের ঐ চাঁদ
ফুলগুলো সুবাসিত হচ্ছে তোমারই জন্য
তবুও চুপ করে মনমরা হয়ে থাকবে !!!

এই বোকা! গতকাল নাকি খুব রাতে
একা একা ছাদে উঠেছিলে???
ভয় করেনি! তোমার ভুতে ভয়
খুব সাহসি হয়েছো দেখছি আজকাল
মন এতটা বিষন্ন করে ছিলে??

কি ভাবছো! কিভাবে জানলাম তাইতো?
বোকা! আমি না জানলে কে জানবে বলো তো!!
তোমার প্রতিটি দিনের প্রতিটা মুহূর্ত
আমার খুব করে আছে জানা।
তাই এখন আর চলবে না বাহানা
তুমি কি ভাবছো আমি অনেক দূরে
চলে গেছি তোমার থেকে ???
উহু মোটেই না! আমি তোমার খুব কাছে
নিঃশ্বাসে অনুভব করে নিও আমায়
মনের বিশ্বাসে রেখ আমায়,
আর রোজ রোজ আমায় ভেবে
মনমরা হয়ে থাকবে না বললাম
আমার স্মৃতির শিকলে বন্দি হয়ে
বিষাদের অশ্রু ঝরাবে না আর
আমার কবরের দিতে তাকিয়ে
শেষবারের মত আমার মুখটা
একদম মনে করবে না বুঝছো!!

তুমি আমার কে

জান্নাতুল নাঈম সানজিদা
সিভিল (পর্ব ৭/১(এ)

সত্যি করে বলো দেখি তুমি আমার কে?
শুধু বন্ধু ভাবতে গেলেই মাথা ধরে যে।
মাথা ধরা ছাড়লে বাড়ে মনের উপর চাপ,
কাছে আছো ভাবলে বাড়ে দেহের যত তাপ।
সত্যি করে বলো দেখি এমন কেন হয়?
তুমি নেই ভাবলে জীবন ভরে শূন্যতায়।
শূন্য মাঝে কিসের টানে টানো অকারণ?
উত্তর না পেলে কিন্তু রাখবো না জীবন।

শোনো কাল থেকে তোমায় আবার
আগের মতন হাসি-খুমি দেখতে চাই
তুমি কষ্টে থাকলে কতটা কষ্ট হয়
আমার সে-কি তুমি জানো না??

এই বোকা! যাওতো উঠো এবার
এককাপ কপি করে খাও তো
মাথাব্যাথাটা ছেড়ে দিবে এক্ষুণি
এখন কি আমি আছি
যত্ন করে বনিয়ে দেবার জন্য
একটু নিজের খেয়াল রাখো তো
এবার একটু গুছিয়ে নেও নিজেকে,।

প্রতিবাদ

আল-আমীন
সিএমটি (৫/১বি)

তুমি কি বধির? আজও কী শুননী!
ভোলার সে কাহিনী
তুমি কী ভালোবাস নি?
যার জন্যে সৃষ্টি তুমি,
তাকে কী খুঁজনি?
তবে কেন এ কাহিনী
বলে কোন লাভ নেই তবুও বলি
চাকরি করে প্রশাসন বাহিনী
বুকের ভালোবাসা আজও তো দেখিনী
তাদেরকে বলে কী বুঝাতে চাও?
তুমি কী ভিখারী? তুমি কী বেহুশ?
তোমার কী ভাসে না মনে?
"ভোলতে প্রাণ দিল ক'য়জনে"
হউক তারা জান্নাতি।
জেগে ওঠ এক্ষুনি? থাকতে পারিনি
মোহাম্মদকে ভালোবাসি!
ফুকারি দিয়ে বলো, বিচার চাই এক্ষুনি?
নইতো চাই না আর কোন বাহিনী?
দেখিয়ে দিব আমরা, কী করতে পারি?

মোরা বাংলার সন্তান

রোমানুর রহমান রোমান
এআইডিটি (৫/১)

মোরা এদেশের তরুন সন্তান
রাখব বাংলার মান
সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার
যারা এদেশের অমর সন্তান।
মোরা হতে চাই তেমন সন্তান।
যারা দিয়েছে তাদের প্রাণ,
মাতৃভাষাকে মোদের করেছে দান।
নবীন যাত্রী যারা হও আগুয়ান
মোরাও রাখব বাংলার মান,
হে বাংলার তরুন সন্তান হও সাবধান
তোমরাই আদায় কর ন্যায্য মাল
মোরা যেদিন হব এ দেশের দূরন্ত সন্তান
সেদিন হবে মোদের সার্থক জীবন
মোরা থাকব রাজি দিতে জান বাজি
তবুও রাখব বাংলার মান
মোরা এদেশের তরুন সন্তান।

অপেক্ষা

সজীব সানি
সিএমটি (৫/১বি)

চাঁদনি রাত
একটুও মেঘ নেই আকাশে,
নেই কোনো কুয়াসা, যদিও রাতটি শীতের।
এখনো বাকি আছে অনেক কিছু পাওয়ার
তাই তো এত অপেক্ষা।
আজ কোনো ভয় নেই মনে, যদিও রাতটি বেশ অন্ধকার
কেবলই ভাবি কখন কখন আসবে সকাল?
কখন দেখব তারে?
এক পলকের তরে।
..... আকাশের ভাসা ভাসা গোনা শেষ
চোখের পাতাগুলো তবুও এক হতে চায় না
কেবলই ঘন হয়ে উঠেছে নিঃশ্বাস
তবুও গুনে চলি, এক তারা... দুই তারা... তিন তারা...
সকালের অপেক্ষায়।

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি

জিহাদ পারভেজ
সিএমটি (৫/১ বি)

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি,
সেই স্মরণকালে আমার জন্ম হয়নি।
আমি দেখিনি, দেশীয় রাজাকার আর পাকবাহিনীর লুটতরাজ
দেখিনি, আমার বাংলা মায়ের সন্তানদের নির্বিচারে হত্যাকৃত লাশ,
দেখিনি, মা-বোনদের উপর করা নিষ্ঠুর সেই আচরণ।

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি
কিন্তু আজ দেখি
সন্তান হারা মায়ের আত্মচিৎকার
বাবাহারা সন্তানের আহাজারী,
ভাইহারা বোনের কষ্টগুলো।

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি,
কিন্তু আজ ভাবনার পড়ে যাই।
কী করে মানুষ এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে,
কী করে বাংলার কুলাঙ্গারেরা অর্থ ও ক্ষমতার লোভে নিজ দেশে হামলা করে,
কী করে বাংলা মায়ের সন্তানদের তুলে দেয় ঘাতকের হাতে।

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি
কিন্তু আজ গর্ববোধ হয় তাদের প্রতি
যারা এদেশকে স্বাধীন করার জন্য ঘাতকের বিরুদ্ধে লড়েছেন,
যারা বাংলা মায়ের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেছেন,
যারা প্রাণের বিনিময়ে বাংলা মাকে রক্ষা করেছেন।

আজি আমি গর্বিত বাংলার বুকে জন্মেছি বলে,
আজ আমি পরিপূর্ণ্য বাংলা আমার মাতৃভাষা বলে,
আমি স্বার্থক বাঙালি
সত্যিই আমি স্বার্থক বাঙালি।

পাল্টিয়েছে বেশ

মোঃ জহিরুল ইসলাম
ইলেকট্রনিকস (৭/২)

আজও গা টা চমকে উঠে
ভয় জাগে যে মনে,
একাত্তরের পঁচিশ মার্চ
রাতের সেই ক্ষনে।
রাতনিশিথে বুটের শব্দ
দরজায় কড়া নাড়ে,
দরজা খুলে চমকে উঠি
হানাদারের ডরে।
সেই হানাদার, পাক হানাদার
মুখে উর্দু বুলি
নিরস্ত্রদের বুকে চালায়
রাত নিশিথে গুলি।
মা বোনেদের ধরে নিয়ে
ইজ্জত নিল কেড়ে,
বীরাঙ্গনা হয়ে আজও
কাঁপে যে সেই ডরে।
সেই হানাদার হেরে গেছে
স্বাধীন বাংলাদেশ
স্বজন তাদের আজও আছে
কেবল পাল্টিয়েছে বেশ।

অমানুষ

মহসীন আহমেদ
সিটি (১/২)দ

গগন ফেরে চাঁদ উঠেছে
যেন রুপালি চাঁদনি রাতি।
তারই মাঝে গল্প জুড়িছে-
আহা, নানার সাথে নাতি।
নানা কহে নাতির কাছে
শুনেছি নাকি দৈত্য আছে
নানা শুনে মুচকি হাসে;
কয় নাতিরে, 'কথাটা মিছে'।

বল নানা তাহলে কেন
পেপারে আসে ঘনঘন-
ঘরের ছেলে উধাও হলো!
নেই কি দেশে দৈত্য কোনো?
শুনেছি নাকি ডাইনি আছে
ঘুরে বেড়ায় মানবি বেশে
সহসা সবার সুযোগ বুঝে
ঘাড়টা মটকে রক্ত চুষে।
এবারো নানা মুচকি হাসে!

তাহলে কেন সেদিন ভোরে
পেলেম যারে ছাদের 'পরে
রক্তাক্ত সারা শরীর জুড়ে
তাকে কে করেছে এমন করে?

নানা কহে নাতির সনে,
নাহি দৈত্য কোনোখানে।

জানি কিছু জন্তু আছে।
অমানুষ তারা মানুষ সাজে
হিংস্র দেও-দানব যত
হার মানবে তাদের কাছে।

শিক্ষক

বিপ্লব দেব
আর্কিটেকচার ইনটেরিয়র ডিজাইন (৩/১)

শিক্ষক মোদের প্রাণের গুরু,
আর্দশেরেই প্রতীক,
শিক্ষক হলেন আলোর পথের,
সত্যযাত্রী নির্ভীক।
মায়ের কাছে শিশুর শিক্ষা,
জন্ম থেকেই শুরু।
মায়ের পরে শিক্ষক হলেন.
জ্ঞানের পথে গুরু।
শিক্ষক সকল ন্যস্ত থাকেন
জ্ঞান ছড়ানোর চাষে,
জ্ঞানার্জনের জন্য সকলে
তাঁদের কাছে আসে।
যেসব শিক্ষক আর্দশতায়
শিক্ষা দিতে রত,
তাঁদের দেখলে হয় যে আমায়
শ্রদ্ধায় মাথা নত।

অভিমান

মাসুদা আক্তার (শারমিন)
সিএমটি (৭/১)

এই যে তুমি জেদ করেছো
করবে না আর দেখা।
ঘুমের শেষে বাকি ভোরটা
কাটাবে একা একা।
এই যে তুমি জেদ করেছো
বলবে না আর কথা
রাস্তার মাঝে বৃষ্টি হলে
ধরবে না আর ছাতা।
সত্যি তুমি পারবে এসব
সঠিক তুমি জানো?
আদো ওকি আমার থেকে
নিজেকে বেশি চেনো?

বন্ধু

মোঃ রুবেল শেখ
সিভিল (পর্ব ৭/১)

বন্ধু মানে মস্ত আকাশ, আকাশ ভরা নীল
বন্ধু মানেই উড়ন্ত আর দুরন্ত গাঙচিল।
বন্ধু মানে সকাল বেলা, বন্ধু মানে সাজ
বন্ধু মানে মনের কথা বলতে কিসের লাজ।
বন্ধু মানে ফাঁকা মাঠে, একটু খানি হাওয়া
বন্ধু মানে এই জীবনে অনেকখানি পাওয়া।
বন্ধু মানে ঝুম বৃষ্টি, বন্ধু দখিন হাওয়া
বন্ধু মানেই অল্প খাবার দুজনে মিলে যাওয়া।
বন্ধু মানে ফাগুন হাওয়া, ফুল ফোঁটানো রাত
বন্ধু মানে সুখে-দুঃখে বাড়িয়ে দেওয়া হাত।

বন্ধু

সত্যবদী চৌধুরী রিয়া
সিএমটি (৭/১)

বন্ধু শব্দের মাঝে মিশে আছে নির্ভরতা,
বন্ধু শব্দের মাঝে মিশে আছে বিশ্বাস।
বন্ধু আর বন্ধন যেন একই মুদ্রার ওপিঠ ওপিঠ।
বন্ধুত্ব মানেই যেন হৃদয়ের সবটুকু আবেগ নিঃড়ে
ভালোবাসা দিয়ে মন খুলে জমানো কথা বলা।
বন্ধুত্ব হচ্ছে সবকিছুতেই একতা থাকা,
বন্ধু হচ্ছে সেই চিরচেনা ছেলেবেলার
স্কুলের মাঠে হাত ধরে হাঁটা।
বন্ধু মানেই বাড়াও হাত, বন্ধু মানে না দিন না রাত,
বন্ধু..... ভালো থাক ॥

প্রবাহমান খোয়াই

পপি আক্তার
সিএমটি (৭/১ (বি)

বারে বারে মনে পড়ে
গিয়েছিলাম খোয়াইর তীরে।
বয়ে ছিল স্নিগ্ধ হাওয়া।
মাঝে মাঝে রৌদ্রের ঝলকানি
দক্ষিণা বাতাস তাই দেয় হাতছানি।
আখের কানন, কাশ আর কলাবন
ছুঁয়ে দেয় মোর, কেড়েড় নেয় মন।
আবার নদীর ঘায়ে ছোট বড় ঢেউ,
না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করবে না কেউ।
গাইছে গান পাল তুলে
বাইছে মাঝি নাও
সুধাই আমি নদীটারে
'খোয়াই তুমি কার পানে ছুটে যাও'।
পুলকিত নয়নে আমি, শুধু চেয়ে থাকি
মনে মনে কল্পনাতে খোয়াইর ছবি আঁকি।
মুগ্ধ হই অপরূপ দৃশ্য দেখে
নদীটা চলছে একে বেঁকে।
তাই নেচে ওঠে হিয়া মোর ভরে উঠে প্রাণ,
ইচ্ছে হয় যেন গাই উল্লাসের গান
কিন্তু আমি গায়িকা নই
তাই কবিতা মোর
মনের মত কই

অভিলাষ

মৌ রাণী দাস
সিএমটি (৭/১)

দেখা যাচ্ছে এই তো
ডাক দিলে যদি শুনত
সবুজ গাছের মতো স্থান
মা বলত আত্মজা আমার থাকে ঐকান
বোনটি বলত ইস!
একটু যদি বের হত
পেতাম তাকে দেখতে।
বুঝতনাতো সেই পাগলীটা
এটা শুধু আলেয়া।
টাওয়ারের এই রশ্মিগুলো
সংকেত ছিল শুধু।
সে যাই হোক
বাঁধনতো দূরত্বে আটকে নয়
দূরত্ব থাকলে এমন মোর জুড়ে রয়।

কবর

মোঃ নুরুজ্জামান রাজু
সিএমটি (৭/১ (বি)

তাই দেখা যায় কবর স্থান
এই আমাদের ঘর
অই খানেতে থাকতে হবে সারা জীবন ভর
ও কবর তুই চাস কি
ঘুষ আমি খাই না
মুমিন বান্দা পাই না
একটা যদি পাই
এমনি করে তাকে জান্নাতে পাঠাই।

স্বপ্ন মোদের আকাশ ছোঁয়া
গর্ব মোদের দেশ
বাধ সেজেছে শকুন রুপি
শেখ হাসিনার দেশ।

একতা বদ্ধ সাহস নিয়ে
গড়ল প্রতিরোধ
সমরাঙ্গ তখন যেন
মুক্তিযুদ্ধের রুপ।

সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু
দিলেন মুক্তির ডাক
সেই ডাকেতে ভেঙ্গে গেল
পাকিস্তানির পাথ।
নয় মাস যুদ্ধের
পর পেলাম স্বাধীনতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
হলেন জাতির পিতা

আমার ভালবাসা

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান
আর্কিটেকচার এন্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন(১/৩)

আমি ভালবাসি বিপদের বন্ধুকে
কোনো স্বার্থপরকে বন্ধুকে নয়।
আমি ভালবাসি আত্মবিশ্বাসীকে
মুখোশ পড়া শয়তানকে নয়।
আমি ভালবাসি বইপড়াকে
অযথা সময় কাটাতে নয়।
আমি ভালবাসি ঘাসের শিশিরকে
চলনার জলকে নয়।
আমি ভালবাসি দুঃখের অনুল পুড়তে
কাউকে পোড়াতে নয়।
আমি ভালবাসি চাঁদের হাসিকে
সূর্যের প্রখরতাকে নয়।
আমি ভালবাসি ফুল ফোঁটা দেখতে
ঝড়ে যাওয়াকে নয়।
আমি ভালবাসি বিশ্বাসীকে
কোন ধোকাবাজকে নয়
আমি ভালবাসি ওয়াদা পূরণকে
কোন বেঈমানকে নয়।
আমি ভালবাসি কারিগরি শিক্ষাকে
সেখানে হাত-কলম শিক্ষা দেয়া হয়।
আমি ভালবাসি আজকের দিনটাকে
যেদিন ম্যাগাজিনে কবিতা
আমার প্রকাশিত হয়।

অনন্যা

সানজিদা আখঞ্জি শান্তা
সিভিল (৫/১)

আমি হতে চাইনা
মাদার তেরেসা কিংবা বেগম রোকেয়া
আমি হতে চাইনা
শেখ হাসিনা কিংবা বেগম জিয়া
আমি হতে চাইনা
করবী কিংবা সুচিত্রা সেন
আমি হতে চাইনা
রূপা কিংবা নাটোরের বনলতা সেন
আমি হতে চাইনা
নিশাত মজুমদার কিংবা ওয়াসফিয়া নাসরিন
আমি হতে চাইনা
আশা ভোসলে কিংবা সাবিনা ইয়াসমিন
আমি হতে চাই
যে কাজ করবে সবার জন্য
আমার পরিচয়
আমি এক ও অনন্যা।

জন্মভূমি

মেহেদী হাসান
সিভিল (৫/১)

তোমাতেই জন্ম;
তোমাতেই কর্ম;
তুমিই জন্মভূমি;
তোমার কোলে মাথা রেখে
ধন্য হয়েছি আমি।

৭১ এর যুদ্ধে মাগো
হয়েছে তোমার জন্ম,
আজও আমি গর্ব করি
বুঝেছি ভাষার মর্ম।

দেশ বিদেশে তোমার নামে
গাইযে কত গান...।
তোমার জন্য জীবন দেব
রাখব দেশের মান।

বাঙালির হাজারো মাতৃভাষা

মোঃ জুনাইদ আলী
সিভিল (৫/১)

মাতৃভাষা আমাদের বাংলা ভাষা
এসেছে বাংলার সেই চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে,
এসেছে নজরুল আর রবীন্দ্রনাথ থেকে,
এসেছে সেই পালযুগ নামে চিত্রকলা থেকে।

মাতৃভাষা আমাদের বাংলা ভাষা
এসেছে ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে,
এসেছে একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদদের বিনিময়ে
এসেছে বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে।

মাতৃভাষা আমাদের বাংলা ভাষা
এসেছে সাহসী বীর সন্তানদের রনের বিনিময়ে
এসেছে ৫২-এর সাহসী মায়ের চক্ষুজলের বিনিময়ে,
এসেছে বাঙালি জাতির বিজয়ের বজ্রকণ্ঠ থেকে।

মাতৃভাষা আমাদের বাংলা ভাষা
এসেছে ৭১-এর সেই মুক্তিযুদ্ধ থেকে,
এসেছে ৩০ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে
এসেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে।

পহেলা বৈশাখ

মরিয়ম আক্তার প্রিয়া
সিভিল (৫/১)

বৈশাখী রোধে আবার বেজেছে রঙিন কাঁচের চুড়ি
দক্ষিণা বাতাসে আজ উড়াব আমার মন ঘুড়ি,
বাসন্তি রং শাড়ির ভারে আজ আবার হারাব,
কৃষ্ণচূড়ার লাল আগুনে মন আবার পুড়াব।
আজ নাচবো, আজ গাইবো, আজ মাতবো মন খুলে
আজ নাচাবো, আজ গাওয়াবো, আজ মাতাবো সব ভুলে
আজ অনেকদিন পর হবে আমার সমর্পন
মন ঘুড়িটায় থাকবে ভরে লাজুক শিহরণ
আজ মন বাসুরির সুরে সুরে মন সাজাবো
যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় আজ তোমায় জাগাবো
তুমি হাসিবে, তুমি নাচবে, জড়াবে আমায়
তুমি দুষ্টু চোখের চাওনিতে আমায় ভরাবে
আজ বৈশাখি মেলায় তোমার নিমন্ত্রন
আজ ধন্য বড় ধন্য আমার ক্ষুদ্র তুচ্ছ জীবন

মন পেতে প্রেম সংখ্যা

মাহবুব আলম
সিভিল (৫/২)

অস্ত্র দিয়ে করতে পার
দেশ মহাদেশ বিশ্ব জয়
লাঠির জোরে বিরাট হাতি
সেও করবে তোমায় ভয়
বিমান দিয়ে যেতে পার
মঙ্গল কিংবা চাঁদের দেশে
দেখবে তুমি জাহাজ চড়ে
নদী সাগর সবই শেষ।
কিন্তু কারও মন পেতে ভাই,
অস্ত্র, লাঠি, জাহাজ বাদ
ভালোবাসা ছাড়া তাতে
চলবে নাকো কোন হাত
প্রেম দিয়ে কঠিন মনকে
বাঁধতে পার নিজ মনে
আঠার মত লাগবে জোড়া
ছাড়বে না ক্ষণে ক্ষণে

ভালো থেকো

আফরোজা
সিভিল (৫/২)

ভালো থেকো ফুল, মিষ্টি বকুল ভালো থেকো
ভালো থেকো ধান ভাটিয়ালি গান ভালো থেকো
ভালো থেকো মেঘ, মিটিমিটি তারা
ভালো থেকো পাখি, সবুজ পাতারা
ভালো থেকো।
ভালো থেকো চর, ছোট কুড়েঘর, ভালো থেকো
ভালো থেকো চিল, আকাশের নীল, ভালো থেকো
ভাল থেকো মাঠ, রাখালের বাঁশি।
ভাল থেকো লাউ, কুমড়োর হাসি।
ভালো থেকো আম, ছায়া ঢাকা গ্রাম ভালো থেকো
ভালো থেকো ঘাস, ভোরের বাতাস ভালো থেকো।
ভালো থেকো রোদ, মেঘের কোকিল
ভালো থেকো বক, আড়িয়াল বিল,
ভালো থেকো নাও মধুমতি গাও, ভালো থেকো
ভালো থেকো মেলা, লাল ছেলেবেলা ভালো থেকো
ভালো থেকো, ভালো থেকো, ভালো থেকো।

তবু মনে রেখো

মোঃ সোহানুর রহমান (সোহান)
সিভিল (৫/২)

তবু মনে রেখো যদি দূরে চলে যাই
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমে
যদি থাকি কাছাকাছি
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি
তবু মনে রেখো
যদি জল আসে আঁখিপাতে
একদিন যদি জীবনখেলা থেমে যায় মধুরাতে
তবু মনে রেখো।
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে
তবু মনে রেখো
যদি মনে পড়ে
ছলোছলো জল নাই দেখা দেয় নয়নকোনে
তবু মনে রেখো....--

কবরস্থান

খাদিজা আক্তার শিফা
সিএমটি (৫/১)

ঐ দেখা যায় কবরস্থান
ঐ আমাদের ঘর।
ঐ খানেতে থাকতে হবে
সারাজীবন ভর।
ও কবর তুই চাস কি,
টাকা পয়সা নিস কি।
ঘুষ আমি খাই না,
মুমিন বান্দা পাই না।
একটি যদি পাই,
ওমনি তারে জান্নাতে পাঠাই।

অভিমান

মোঃ মিনহাজুর রহমান
এআইডিটি (৫/১)

সেদিন ও এসেছিল বসন্ত
বুঝে ছিল ভালবাসা অফুরন্ত;
তুমি আসবে বলে-
এনেছিলাম ফুল-গোলাপ-কদম-কৃষ্ণচূড়া
লিখেছিলাম গান, কবিতা আর ভালবাসার ছড়া।
তবুও তুমি এলে না- ভালবাসা দিলে---
আরেও তমি জেনে নাও
ভালবাসা না দাও শুধুই শুধুই ভালবাসা নাও
আর কিছুই চাইনা আমি
হাসি মুখে ব্যথা দিলে তুমি।
জানি তুমি জানি আসবেই ফিরে একদিন
মরণের আগে পরে হয়তো কোনদিন
--- যদি তুমি ফিরে আসো
কোন এক শ্রাবণ মাসে
হয়তো আমায় নয়-স্মৃতিগুলো পাবে পাশে--- ॥

স্মরণ

মোঃ মুছা ইব্রাহিম
সিভিল (৫/২)

অচেনা অজানা অতৃপ্ততার মাঝে
রয়ে যায় সেই অসমাপ্ত প্রেম কাহিনী
ঝড়া পাতার ঝড়ো হাওয়ার অদৃশ্য ছোঁয়ায়
দোলনার মতো দুলে যায়
তোমার সেই স্পর্শের অনুভূতি
তখনি ডাক পড়ে যায় মেঘভেলা আকাশে
চেয়ে দেখি ফোটায় ফোটায়
সেই চেনা মুখটি ভাসে
মেলতে নাহি পাড়ি চোখের পাতা
নিঃস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছি তাই
হাত বাড়িয়েও ধরতে পারিনি ছাঁতা।

ঘুম

তৌহিদ তোফায়েল আহমদ
সিভিল (৫/২)

ঘুম তোমাকে এবার আমি
করছি যে হুঁশিয়ার
পড়ালেখার সময় তুমি
আসবে না'ক আর।
যখন আমি গল্প করি
পাইনা তোমার খোঁজ,
যখন আমি পড়তে বসি
তোমায় দেখি রোজ।
তুমি আমার রাতের সাথী
আসবে গভীর রাতে,
চলে যাবে আবার তুমি
সূর্যদয়ের সাথে।

বন্ধুত্ব

সানজিদা আক্তার সুষমা
এআইডি (৫/১)

বন্ধু হবে আশার আলো
বাসবে তোমায় অনেক ভালো।
বন্ধু হবে এমন,
যে হবেনা তোমার কান্নার কারণ।
বন্ধু হবে এমন,
যে হবে তোমার মনের মতন।
বন্ধু হবে এমন,
যে হাসাবে তোমায় সারাক্ষণ।
বন্ধু হবে এমন,
যে মনে রাখবে তোমায় আজীবন।
বন্ধু হবে এমন,
যে ধরে থাকবে তোমার হাত সারাজীবন।
বন্ধু হবে এমন,
যে পছন্দ করবে তোমার সবকিছুর ধরণ।
বন্ধু হবে এমন,
যার সাথে রাগ করার পাবে না কোনো কারণ।
বন্ধু হবে এমন,
যে একটু দেরি হলেই, কল দিয়ে বলবে-
"আর কতক্ষণ".....

না বলা কথা

সৌরভ আচার্য্য
এআইডিটি (৫/১)

প্রথম জীবনের ভালবাসার কথা
কখনো বলা হয়নি তোমাকে!
অনেকটা বসন্ত পেরিয়ে গেছে
ভুলেই ছিলাম তোমার কথা!

হঠাৎ তুমি উদয় হলে মনের আকাশে
নিশুতি রাতে ধ্রুবতারার মতো!
কতো কথা, কতো স্মৃতি রোমন্থন
ভাব বিনিময় অতি সঙ্গপনে!

বাতাসে ভেসে আসা কথার পংক্তিমালা
আমার কানে বাজে রিনিঝিনি শব্দে!
রাগ, অনুরাগ মিশ্রিত কথোপকথন
আমাকে ভাসিয়ে নেয় অতীতের কাছে!

যখন তুমি বললে-
তুমি কি জানো? ভালো লাগে তোমাকে!
আমি কম্পিত কণ্ঠে বললাম
আমিও ভালবাসি অনেক, অনেক
যা কিনা বলা হয়নি তোমাকে!!

নদীর সৌন্দর্য্য

আশরাফুল ইসলাম
সিএমটি (৫/১)

ভোরে আমি ঘুম থেকে উঠি
মোয়াজ্জিনের ডাকে।
ইচ্ছে করে ঘুরতে যাই,
খোয়াই নদীর বাকে।

সেই খানেতে আছে কত,
নাম না জানা ফুল।
লিখতে গেলে হয় যেনরে,
শত রঙ্গের ভুল।

সেই নদীতে চলে কত,
রঙ-বেরঙের নৌকা।
নাম যেন হয় তাদের
বজরা, ডিঙি, চৌকা।

নদীতে আছে যেন
নানা রকম মাছ।
দুই তীরে দন্ডায়মান
সবুজ বৃক্ষরাজ।

গাছে গাছে পাখিরা
করে কুজন।
হিমেল হাওয়া যেন
মন করে হরণ।

সাদা, স্বচ্ছ বালিতে পূর্ণ,
নদীর দুই তীর।
গায়ের মানুষের সঙ্গে নদীর
সম্পর্ক গভীর

বর্ষাকালে নদীর পানি
ফুলে ফেপে ওঠে।
ভাটির দিকে স্রোতের ধারা,
প্রবল বেগে ছুটে।

অপরূপ এই নদীখানি,
হবিগঞ্জের গর্ব।
নদীটিকে বাঁচিয়ে রাখতে,
আমরা সবাই-ই লড়ব।

স্বাধীনতা

জাহেদ আহমদ
এআইডিটি (৫/১)

হায়েনা শকুন এসেছিল
সবুজ শ্যামল এই দেশে
রক্ত লুলোপ চোখে শাসার
থাকবি তোরা পর সেজে।

রক্ত জল মিশেল করে
ছটলো পথে আগুন মিছিল
লাল সবুজে স্বাধীনতা এলো
শহিদ হলো সুজন সুশিল।

স্বাধীনতা নয় যা ইচ্ছে তাই
যা মনে চায় করে ফেলা
স্বাধীনতা হলো সবার জন্য
নিয়ম করে পথ চলা

অন্ন কাপড় বাসস্থানে
থাকবে না কেউ অবহেলায়
আইনে শিক্ষায় সম অধিকার
মূলে আছে সব স্বাধীনতার।

সব শিশুরা উঠরে বেড়ে
মায়ের কোলে হেসে খেলে
ক্ষুধা তৃষ্ণার কাঁদবে না কেউ
স্বাধীনতা যে তাই বলে।

পদ্মা সেতু

মোঃ সাদিকুর রহমান
সিভিল (১ম/২য়)

আজ বাংলার আকাশে রংয়ের ছোঁয়া
পদ্মা সেতু আজ আমাদের পাওয়া।
এখন আর নদী পার হতে দিতে হবে না তাজা প্রাণ
ফেরির মধ্যে দাঁড়িয়ে এম্বুলেন্স গাইবে না মৃত্যু গান।

উত্তাল পদ্মা তুমি দেখাইয়াছো,
তোমার বহু ভয়ঙ্কর রূপ।
এখন তোমার মধ্যেই মুজিব কন্যা বসাইয়াছেন সৌন্দর্যের স্তূপ।

বাংলার দক্ষিন অঞ্চলের লোকেদের আতংকের পদ্মা,
এখন তার নাম সৌন্দর্যের সাজসজ্জা।
কল্পনার খোলস ছেড়েছে সব
জল্পনার ইতি টেনে।

বিশ্বে মহাবিস্ময়ে মাথা তুলেছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু।
নিজের স্বার্থ, নিজের অর্থ নিজের হাতে গড়া,
স্বপ্নের এই পদ্মা সেতু ভালোবাসায় মোড়া।
পদ্মা সেতু আমার আবেগ, আমার বড় অহংকার
স্বাধীনতার পঞ্চাশে বাংলার সেরা উপহার।

বাবা

প্রান্ত দাস
সিভিল (১/১)

আমার অন্ধকারে বাতি তুমি
তুমি রাতের তারা,
দিনের বেলায় সূর্য তুমি
তুমি সন্ধ্যার তারা।
বাবা নামের বটগাছ তুমি
জড়িয়ো রাখো মোদের,
আপন কপাল খনন করে
উঁচুতে রাখলে মোদের।
আমাদের খাবার দিতে করলে কত ধার
আপন রক্ত পানি করে মেটালে পাওনাধার
চোখ বুজে আমি যখন তোমার কথা ভাবি
দুই চাকার মানব গাড়িতে দিয়েছ তুমি সবি।
মোদের সুখেতে তোমার সুখ ছিল আ-জীবন
এই সুখের মূলমন্ত্র করব অনুসরণ।

আমরা শিক্ষার্থী

আবু তালেব শুভন
সিএমটি (৫/১এ)

শিক্ষিত হয়ে যারা চলে
অন্যায়ের রাস্তায়
তাদের ঘৃণা শুধু মানুষের নয়
রাস্তায়ও ভয় পায়।

শিক্ষা হলো পবিত্র নাথ
জনতায় করে সম্মান
শিক্ষার আলোয় দেয়া যায়
সমাজে শান্তির ঘ্রাণ।

দেশকে মোরা ভালোবাসাব
দিয়ে মেধা ও শ্রম
দেশের জন্য করব সবে
সমৃদ্ধ ইতিহাস গঠন।

দেশের যত উন্নয়ন কাজ
নেব অংশগ্রহণ,
দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায়
হবো সচেতন।

আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে
দুর্যোগ আসবে যখন,
দুস্থদের পাশে গিয়ে
তাদের কষ্ট করব বন্টন।

আমরাই শুধুই ছাত্রই নয়
দেশের ভবিষ্যৎ
দুর্নীতিকে না বলব

ধাঁধা/গুগলি

১। ভেবে চিন্তে বল সবাই
কোন বাচ্চার মা নেই?

উত্তর : চৌবাচ্চা

২। কোন সাগরে নেই জল
ভেবে চিন্তে উত্তর বল।

উত্তর : বিদ্যাসাগর

৩। এমন একটা দেশ চাই
যে দেশে মাটি নাই
এমন আজব দেশ ভাই
খেতে মজা পাই।

উত্তর : সন্দেশ।

সংগ্রহে:
সানজিদা সুষমা, এআইডিটি (৫/১)

১। মাটির তলার বাড়ি
পরনে তার লাল শাড়ি
ঘোরে সবার বাড়ি বাড়ি।

উত্তর : পেঁয়াজ।

২। কোন জিনিসের ডানা থাকে না,
তবু সে আকাশে উড়তে পারে?

উত্তর : ঘুড়ি

৩। তোমাকে শুকিয়ে নিজে সে ভিজে,
উত্তরটা বলো দেখি, চেষ্টা করে নিজে।

উত্তর : গামছা বা টাওয়েল।

সংগ্রহে :
জাহেদ আহমেদ, এআইডিটি (৫/১)

১। কোন বরের বিয়ে হয় না?
উত্তর : খবর

২। নীরা নব্বই টাকা থেকে ৫০ টাকা খরচ করলে কত টাকা থাকে ?
উত্তর : ৪০ টাকা।

৩। কোন খাবার না খেয়ে ফেলে দেয়া হয়।
উত্তর : তেজপাতা।

৪। কোন খাবার খাওয়ার আগে ভেঙ্গে নিতে হয়?
উত্তর : ডিম

৫। কি বছরে আসে মাসে যায়, দিনে খায় নাম, রাতে খায়?
উত্তর : রোজা।

৬। কোন জিনিস ফ্রিজে রাখার পরেও গরম থাকে?
উত্তর : গরম মশলা

৭। গরম নয় কিন্তু ফু দিয়েং খেতে হয় কি?
উত্তর : বাদাম।

৮। রামের বামে, সীতার ডানে আছে কি?
উত্তর : 'র'

সংগ্রহে :
মোঃ মাহমুদুল হাসান, সিভিল (৫/২)

১। ৮+৮=১ কখন হবে?
উত্তর : ১৬ আনায় যখন এক টাকা হয়।

২। ১০+৩=১ কখন বা কোথায় হয়?
উত্তর : ঘড়িতে যখন সময় ১.০০ টা হয়।

৩। আপনি দোকানে গিয়ে এক প্যাকেট বিস্কিট কিনলেন। বিস্কিটের উপরে যে জিনিসটি ফ্রি লিখা ছিল সেটা দোকানে থাকা সত্ত্বেও দোকানদার আপনাকে দিল না। আপনিও কিছু না বলেই চলে এলেন। কেন?
উত্তর : 'Suger Free

৪। আমি তোমার চোখের সামনে সবসময় উঠি আর বসি কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে পাও না। আমি কে?
উত্তর : চোখের পাতা।

৫। ৬ফুট বাই ১০ ফুট বাই ৮ ফুট খালি রুমে কয়টি লাইট আছে?
উত্তর : একটিও নেই।

সংগ্রহে:
মোঃ জহিরুল ইসলাম ফয়সল, সিভিল ৭/১

কৌতুক

জোকস : ০১
মোঃ আল-আমিন, সিভিল (৭//১)

একবার সংখ্যা ৯, ৮ কে জোরে এক থাপ্পড় মারল!
তখন কাঁদতে কাঁদতে ৮ জিজ্ঞাসা করলো- আমাকে মারলে কেন?
৯ বলল- আমি বড় ভাই মেরেছি।
এ কথা শুনে ৮, ৭ কে জোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল!
৭ যখন ওকে মারার কারণ জানতে চাইল, ৮ও বলল আমি বড় তাই মেরেছি।
একই অজুহাত দেখিয়ে এরপর ৭,৬ কে, ৬,৫ কে, ৫,৪ কে, ৪,৩ কে, ৩,২ কে আর ২,১ কে মারলো।
কিন্তু ১ মারলো না। মারা তো দূরের কথা, ও ভালোবেসে শূণ্যকে নিজের পাশে বসিয়ে নিল।
দু'জন মিলে ১০ হল!
তারা তখন ৯ এর থেকে বেশি শক্তিশালী হয়ে গেল তারপর ১০ কে সবাই সম্মান করতে লাগল।

নীতিকথাটি হল ঃ ছোট ছোট কারণে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, লড়াই না করে ব্যক্তিগত অহংকার দূরে সরিয়ে আমরা যদি একে অন্যের হাত ধরতে পারি, এতে আমাদের শক্তি বহু গূণ বেড়ে যাবে।

জোকস : ০২
মোঃ জসিম উদ্দিন, সিভিল (৭/১)

১. শিক্ষিকা ক্লাস রুমে আমাকে প্রশ্ন করলো:-
পুষ্প বল তো, তোমার নামে অর্থ কী?
আমি : ফুল মেডাম।
শিক্ষিকা : গুড! এবার পাঁচটি ফুলের নাম বল?
আমি : বিউটিফুল, ওয়ান্ডার ফুল, গ্রেটফুল, হাউস ফুল ও আশরাফুল।

২. ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে কথোপকথন :-
শিক্ষক : এই যে তোমার আসতে এতো দেরি হলো কেন?
ছাত্র : (মাথা চুলকাতে চুলকাতে) রাস্তার মোড়ে একটা লেখা দেখে।
শিক্ষক : কি লেখা?
ছাত্র : একটা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে, সামনে কলেজ, ধীরে চলুন। তাই আমি, স্যার....।

জোকস : ০৩
মোঃ ইসমাইল আহমেদ, সিভিল (৭/১)

১. দর্জি ও এক ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন :-
ব্যক্তি : দর্জি ভাই, আমাকে এমন একটা শার্ট বানিয়ে দিতে পারবেন যে শার্টের রং সাদা, কালো, নীল, সবুজ, কোনোটাই নয়। এমনকি কোন রং ই নয়।
দর্জি : ঠিক আছে। আপনি শনিবার, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ছাড়া যে কোনো একদিন এসে নিয়ে যাবেন।

জোকস : ০৪

মোছাঃ জান্নাতুল আক্তার, সিভিল (৫/১)

একজন ফোন দিয়ে বলতেছে–

– হ্যালো

– হ্যালো কে?

- আমি সবেদ।

- কোন সবেদ?

- আমার বাড়ি গাইবান্ধা।

- কার গাই বান্ধা?

- কারো না। আমার বাড়ি গাইবান্ধা।

- কি মুসকিল। সেটাই তো জিজ্ঞেস করতাছি। কার গাইবান্ধ্যা? আর সেটা আমাকে ফোন দিয়া বলতেছেন কেন? আমার তো কোন গাই নাই।

- ধুর ভাই, গাইবান্ধা। আমার বাড়ি গাইবান্ধা।

- আরে ভাই। গাই বান্ধা হলে ছাইড়া দেন। নাইলে জবাই দিয়া মিলাদ পড়ান, আমাকে কইতাছেন কেন?

- ভাই গো! ও ভাই... গাইবান্ধা... মানে আমার বাড়ি গাই বান্ধা।

- ফোন রাখ কইলাম। গাইয়ের লগে তরেও বাইন্ধা রাখুম কইলাম।

জোকস : ০৫

ইসতিয়াক শাহরিয়ার তূর্য্য, এআইডিটি (৫/২)

স্যার ও ছাত্র

স্যারঃ বাংলা ৬ ঋতুর নাম বল?

ছাত্রঃ গ্রীষ্ম, মা, বাবা, কাকা, শীত ও বসন্ত।

স্যার : কি?

ছাত্র : স্যার, আমার মার নাম বর্ষা, বাবার নাম শরৎ এবং কাকার নাম হেমন্ত।

জোকস : ০৬

শেখ মোঃ মাহিনুর হাসান সিয়াম, সিভিল (৭/১)

ক্লাস তৃতীয় শ্রেণির এক মেয়ে প্রথম সাময়িক পরীক্ষার সময় 'কুমির' রচনা শিখেছে। সমস্যা হল এরপর যে পরীক্ষায়ই আসুক সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই কুমিরের রচনাই লেখে। যেমন একবার রচনা এলো "বাবা মায়ের প্রতি কর্তব্য"। তো সে লিখলো– বাবা-মা আমাদের জন্ম দেয়। তারা আমাদের লালন পালন করে। কুমিররা ও তাই করে। জেনে রাখা ভাল যে, কুমির একটি সরিসৃপ প্রাণী। এটি জলে বসবাস করে। এর চোখ গোল গোল। কুমিরের পেঠ খাজ কাটা, খাজ কাটা, খাজ কাটা....

এরপর পরীক্ষায় রচনা এলো আমার 'প্রিয় শিক্ষক'। সে লিখল– আমার প্রিয় শিক্ষক এর নাম মোহাম্মদ রফিক। তার চোখগুলো গোল গোল। কুমিরের চোখও গোল গোল। জেনে রাখা ভাল যে, কুমির একটি সরিসৃপ প্রাণী। এটি জলে বাস করে। কুমিরের ফিট খাজ কাটা।

এইটা দেখার পর শিক্ষক তো মাথায় হাত, এতো ভারী বিপদ। তারপর শিক্ষক অনেক চিন্তা ভাবনা করে রচনার বিষয় ঠিক করলেন "পলাশীর যুদ্ধ"। লেখ মাইয়া, এইবার দেখি তুই কি করে কুমিরের রচনা লিখিস।
তো ছাত্রী লিখলো– ১৮৫৭সালে পলাশীর প্রান্তর ইংরেজ এবং বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলাম। এই যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা তার সেনাপতি মীরজাফর এর উপর ভরসা করে খাল কেটে কুমির এনেছিলেন। জেনে রাখা ভাল যে, কুমির একটি সরীসৃপ প্রাণী। এটি জলে বাস করে। এর চোখ গোল গোল। কুমিরের পিঠ খাজ কাটা, খাজ কাটা, খাজ কাটা..... (দশ পৃষ্টা শেষ)! এইটা দেখার পর শিক্ষক বেহুঁ।

জোকস : ০৭

মোঃ সিদরাতুল মোনতাহা ইমন, সিভিল (৫/২)

একদিন রাতে মফিজের বাসায় চুরি হয়। সে সকালে উঠে দেখে তার বাড়ির বেশ কিছু জিনিস নেই। তখন সে কি করবে ভেবে না পেয়ে পুলিশের কাছে কল করে। 'পুটরুং, পুটরুং'....
পুলিশ : yes, how can I help you?
মফিজ : স্যার আমার বাসায় কাল রাতে চুরি হয়েছে।
পুলিশ : How?
মফিজ : বেটা তো খুব ইংলিশ বলে, আমিও বলবো। Sir, cutting the বাঁশের বেড়া টুকিং the চোর লউইং the জিনিসপত্র going the door..
পুলিশ : what is the বাঁশের বেড়া?
মফিজ : some bamboo stick is খাড়াখাড়া other bamboo stick is পেরেক মারা it is the বাঁশের বেড়া।
মফিজের অসাধারণ সঙ্গা শুনেই পুলিশ বেহুশ।

জোকস : ০৮

মোঃ রাব্বি হাসান, সিভিল (৭/২)

চার পাগল একটি ঘাটে কথা বলছে:
১ম পাগল : শুনেছিস গত রাতে এই পুকুরে আগুন লেগেছিল।
২য় পাগল : তাই নাকি। তাহলে মাছেরা কোথায় উড়ে পালিয়ে ছিল।
৩য় পাগল : যা মাছের কি ঘোড়ার মত পাখা আছে যে উড়ে চলে যাবে।
৪র্থ পাগল : তোরা সবাই পাগল হয়ে গেছিস। ঐ সময় মাছেরা আগুন কে কেরোসিন মেরে নিভাচ্ছিল।

জোকস : ০৯

মোঃ মোবারক মিয়া, সিভিল (১/২)

প্রেমিকা : প্লিজ আমাকে মাফ করে দিও! আজ আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।
প্রেমিক : হ্যাঁ, বলো, বলো কী বলতে চাও?
প্রেমিকা : আমি তোমার সাথে কিছু গোপন করেছি। আসলে হয়েছে কি আমার অন্য একজনের সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, সামনের সপ্তাহে আমাদের বিয়ে। আমি তোমার সাথে এতটা সময় কাটিয়েছি, ফেসবুকে কত কথা বলেছি, ডেটিং করেছি, শপিং করেছি.....
প্রেমিক : ব্যাস ব্যাস। তুমি দেখছি আমাকে ইমোশনাল করে ছাড়বে। এটা কোন ব্যাপার না, চলো আজ আমিও তোমার সাথে আমার বউ আর বাচ্চাদের পরিচয় করিয়ে দেই।

জোকস : ১০

মোঃ আতিকুর রহমান শুভ, সিভিল (১/১)

দুইজন ব্যক্তি গেল চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে...
প্রথমজন আগেই প্রশ্নকর্তাকে ঘুষ দিয়ে রেখেছিলো!!
প্রশ্নকর্তা ১ম জনকে প্রশ্ন করলেন : তুই ডগ বানান কর।
১ম জনে :
প্রশ্নকর্তা : সাবাস।
এরপর প্রশ্নকর্তা ২য় জনকে বললেন : তুই হিপোটটমাস্টিকস বানান কর।
২য় জনে : এটা তো পারি না।
প্রশ্নকর্তা : তুই পারিস না তুই বাদ। ওর চাকুরী হয়ে গেছে।
২য় জন : মানি না। আমারে কঠিনটা ধরছেন ওরে সহজটা ধরছেন।
প্রশ্নকর্তা : ঠিক আছে আবার। এই তুই বল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের কতজন মারা গেছে ?
১ম জন: ৩০ লক্ষ স্যার।
প্রশ্নকর্তা: সাবাশ...
এরপর ২য় জনকে বললেন : তুই ৩০লক্ষ লোকের নাম বল?
২য় জন বেহুশ।

জোকস : ১১

শতাব্দী চৌধুরী রিয়া, কম্পিউটার (৩/১ বি)

শিক্ষক : এই আবুল দাঁড়া। তিনটি উভচর প্রাণীর নাম বল?
আবুল : স্যার একটা হলো ব্যাঙ। আর দুইটা.... স্যার আর দুইটা ত পারি না।
শিক্ষক : তে আছিস রে... আর দুইটা উভচর প্রাণীর নাম বলতে পারিস?
কাবুল : (পেছন থেকে দাঁড়িয়ে) স্যার আমি পারি, একটা হলো ব্যাঙের বাবা আর একটা হলো ব্যাঙের মা।

জোকস : ১২

মোঃ রুমেল মিয়া, সিভিল (৫/১)

এক ছিল বোকা জামাই। শ্বশুরবাড়িতে বোকা বলে সবাই ঠাট্টা করতো। একবার তার শ্বশুরের বড় অসুখ হলো জামাইকে দেখতে যেতে হয়। তার মা তাকে ভালো করে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে বললো, তুই গিয়ে আগ শ্বশুরকে বলবি, কেমন আছেন বাবা? উনি হয়তো বলবেন এখন একটু ভালো আছি। তখন তুই বলবি, হ্যাঁ, সেটাই তো আমার কাম্য। তারপর তিনি কোন ডাক্তারের চিকিৎসায় আছেন জানতে চাইবি। তিনি নাম বললে বলবি, হ্যাঁ খুব নামযশ আছে বটে। বোকা জামাইটি ভাবলো, এ আর এমন কি কঠিন কাজ। তা ঠিক আমি সামলাতে পারবো। পরদিন সে শ্বশুরবাড়ি গেল। শ্বশুরকে দেখেই সে বললো, কেমন আছেন বাবা?
শ্বশুর বলল : আর ভাল থাকা এবার গেলেই হয়।
বোকা জামাই : হ্যাঁ, সেটাই তো আমাদের কাম্য। তা আপনি কোন ডাক্তারের চিকিৎসায় আছেন?
শ্বশুর : এখন একটু বিরক্তির স্বরে বললো 'যমের'।
বোকা জামাই বলল : হ্যাঁ, বেশ নামযশ আছে বটে।

জোকস : ১৩

কামরুন নাহার, সিভিল (৫/১)

স্বামী : এই যে তুমি কী আমার সাথে যোগ ব্যায়াম করবে?
স্ত্রী : ও তুমি আমাকে খুব মোটা ভাবো তাইনা?
স্বামী : না না, ব্যায়াম তো শরীরের জন্য ভালো..
স্ত্রী : ও তাহলে আমার শরীর বুঝি খারাপ।
স্বামী : না না। আচ্ছা তুমি যখন উঠতে চাওনা তবে থাক।
স্ত্রী : ও এবার তুমি বলতো আমি কুড়ে?
স্বামী : ওহো তুমি আমায় বুঝতে পারছো না।
স্ত্রী : ও আমিত অবুঝ।
স্বামী : আমি তা বলিনি।
স্ত্রী : তাহলে কি আমি মিথ্যুক?
স্বামী : সাত সকালে ঝগড়া করো না প্লিজ...
স্ত্রী : হ্যাঁ, আমি তো ঝগড়াটে। সকাল থেকেই ঝগড়া করি....।
স্বামী : ঠিক আছে আমি যাব না যোগ ব্যায়াম করতে.....
স্ত্রী : দেখছো, ইচ্ছে তোমার নেই, আমার ওপর দোষ চাপাচ্ছো।
স্বামী : ঠিক আছে বাবা ঘুমাও তুমি, আমি একাই চললাম...
স্ত্রী : তুমি তো একা একাই ঘুরো আর ফুর্তি কর...
স্বামী : উফ, থাক এবার। আমার শরীর খারাপ লাগছে...
স্ত্রী : দেখছো কি স্বার্থপর তুমি। খালি নিজের চিন্তা করো। আমার শরীর স্বাস্থ্যের কথা কখনো ভাবো।
স্বামী বেচারা আজ তিনদিন বসে বসে ভাবছে "কোথায় কি ভুল বললাম? এভাবে বসে আছে দেখে স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে:
স্ত্রী : তিনদিন ধরে দেখছি ঝিম করে আছ। কাকে নিয়ে চিন্তা কর? কার রঙ ধরছে মনে?

জোকস : ১৪

মোঃ জহিরুল ইসলাম ফয়সল, সিভিল (৭/১)

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে নতুন বউকে :
শ্বাশুড়ী বলছে : মা আজ থেকে তুমি এ বাড়িরই একজন সদস্য। আমার মেয়ে তুমি, আমাকে তুমি মা ডাকবে।
নতুন বউ : আচ্ছা মা।
সারাদিন কাজ শেষে জামাই বাসায় আসছে কলিংবেল বেজে উঠলো।
শ্বাশুড়ি : এই কে এলো, দেখতো বউ মা?
নতুন বউ : মা! মা! ভাইয়া এসেছে।

জোকস : ১৫

রুমা আক্তার, সিভিল (৭/১)

মেয়ে : এই রিকশাওয়ালা কাজি অফিসে যাবে?
রিকশাওয়ালা : এটা কী করে সম্ভব আপা। বাসায় আমার একটা বউ আছে। আপনি আরেক জনকে নিয়ে যান।
মেয়ে : What?

জোকস : ৯৬
মেহেদী হাসান সুহান, এআইডিটি (৩/২)

এক লোক তার বউকে এসএমএস করছিল, কিন্তু মেসেজটি ভুল করে চলে গেল এক মহিলার কাছে।
সেই মহিলার স্বামী গতকাল মারা গিয়েছেন, যাই হোক।
মহিলাটি মেসেজ পড়ার সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কারণ মেসেজটি লেখা ছিল–
প্রিয় বউ,
আমি ঠিকঠাক মতই পৌঁছেছি!! আমি জানি তুমি আমার মেসেজ আশা করনি। এখানে আজকাল ফোন এসে পড়েছে। আমি আসার সাথে সাথে তারা আমায় একটা ফোন গিফট করেছে। সেই মোবাইল থেকেই তোমাকে মেসেজ পাঠালাম। তুমি জেনে খুশি হবে যে এখানে সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। আশা করা যায় কাল পরশুর মধ্যেই তুমি চলে আসবে।
আশা করি আমার মত তোমার যাত্রাও সুখের হবে। তোমার অপেক্ষায় রইলাম।
ইতি
তোমার প্রিয় স্বামী

জোকস : ৯৭
মাসুদা আক্তার (শারমীন), সিএমটি (৩/১ বি)

এক বাবা আর ছেলে বাহিরে রোদে বসে খবরের কাগজ আর বই পড়ছে, হঠাৎ ছেলে বলে–
ছেলে : বাবা, আমি দূরের জিনিস দেখতে পারি না, একটা চশমা কিনে দাও।
বাবা : (সূর্য দেখিয়ে বলল) ওটা কি বল ত বাবা?
ছেলে : আরে বাবা, ওটা তো সূর্য।
বাবা : হারামজাদা, আর কত দুরের জিনিস দেখতে চাস?

জোকস : ৯৮
তৌহিদ তোফায়েল আহমদ, সিভিল (৫/১)

প্রবাসী স্বামীর কাছে গ্রামের এক বধূর ভুল বিরাম চিহ্নের পত্র
ওগো, কতদিন হলো আস। না এই-কি ছিল আমার কপালে আমার পা? আরো ফুলে উঠেছে উঠান। জলে ভেগে গেছে ছোট খোকা। স্কুলে যেতে চায় না ছাগল ছানাটা। ঘাস খেয়ে ঝিমুচ্ছে তোমার বাবা। দীর্ঘদিন ধরে অসুখে ভুগছেন বাগানটা। আমে ভরে গেছে ছাদটা। শ্যাওলায় ভরে গেছে গাভীর পেটটা। দেখলে মনে হয় বাছুর দিবে করিমের বাপ। রোজ ১ বোতল দুধ কিনে দেয় বড় বউ। রান্না করতে গিয়ে হাত পুরে ফেলেছে কুকুর ছানাটা। সারাদিন লেজ নিয়ে খেলা করে বড় খোকা। দাড়ি কাটতে গিয়ে গলা কেটে ফেলেছে রহিমের বোন। প্রসব বেদনায় ছটফট করছে রহিমের দুলা ভাই, বারবার ফিট হয়ে পড়ছেন ডাক্তার সাহেব সকালে এসে দেখে গেছেন। বাড়ির এমন অবস্থায় তুমি আসিবে না। আসিলে খুবই কষ্ট পাইব।
ইতি-
তোমার স্ত্রী কুসুম

বিবিধ

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ

ফখরুল ইসলাম চৌধুরী
ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান

স্কাউটিং হলো জীবনের জন্য শিক্ষা। বিশ্বব্যাপী স্কাউটিং এর একটি শ্লোগান আছে, তা হালো "Creating a Better World" শিশু কিশোর ও যুব বয়সী ছেলে-মেয়েদের ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দায়িত্বশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সহ শিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে স্কাউটিং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি অনন্য শিক্ষামূলক আন্দোলন। স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনসন স্মীথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল ১৯০৭ সালে ইংল্যান্ডের ব্রাউন্সী দ্বীপে প্রথম স্কাউট ক্যাম্পের মাধ্যমে স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু করেন।

২০০৭ সালে হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর তদানীন্তন অধ্যক্ষ জনাব মাহবুবুর রহমান এবং ক্রাফট ইন্সট্রাকটর (কম্পিউটার) ও তরুন রোভার স্কাউট লিডার জনাব মোহাম্মদ শামছুল হক এর আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে রোভার স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস, হবিগঞ্জ জেলা রোভার এর ১১ তম গ্রুপ হিসেবে হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলে তালিকাভুক্ত হয়। গ্রুপের রেজিঃ নম্বর ২০৮৬/২০০৭, তারিখঃ ২২/৮/২০০৭। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি রোভারিং কার্যক্রমে হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করে আসছে। প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বৎসরেই রোভারিং কার্যক্রম আরো বিস্তৃতি লাভ করে। রোভার স্কাউট লিডার জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন এর নেতৃত্বে হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ (খ), এর কার্যক্রম শুরু হয়। যার গ্রুপ নং-১২, রেজিঃ নম্বর ২২১১/২০০৮ তারিখ : ১৭/১২২/২০০৮।

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে রোভারিং কার্যক্রম জোরালো ও সম্প্রসারিত হওয়ায় অত্র ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাসে বিগত ২০-২৪ অক্টোবর, ২০১০ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস, হবিগঞ্জ জেলা রোভার এর উদ্যোগে ১ম হবিগঞ্জ জেলা রোভার মুট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মুটে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জের তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব মাহমুদ হাসান। এছাড়া অত্র ইন্সটিটিউটে হবিগঞ্জ জেলা রোভারের আয়োজনে বিগত ২৬ আগস্ট ২০১৭ সালে সিনিয়র রোভার মেট ওয়ার্কশপ, ২১-২৫ অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত ৩০৮ তম রোভার স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জের তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব মনীষ চাকমা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব ফজলুল জাহিদ পাভেল, হবিগঞ্জ জেলা রোভারের তদানীন্তন কমিশনার জনাব নাজমুল হক, বর্তমান কমিশনার প্রফেসর মোঃ ইলিয়াছ বখত চৌধুরী, সম্পাদক এডভোকেট মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম প্রমুখ।

ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের রোভারিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে রোভার স্কাউট লিডার জনাব সেলিমা খাতুনের নেতৃত্বে গার্ল ইন রোভার স্কাউট গ্রুপ এর কার্যক্রম শুরু হয়। যার গ্রুপ নম্বর-১৮, রেজি নম্বর ২৫০৫/২০১৩ তারিখঃ ২২/১/২০১৩।

বর্তমানে হবিগঞ্জ হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে রোভার স্কাউট ও গার্ল ইন রোভার স্কাউটরা নিয়মিত ক্রু মিটিংয়ে অংশগ্রহণ-করতঃ রোভারিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।বিভিন্ন প্রশিক্ষন যেমন রোভার মেট কোর্স,স্কাউট বেসিক কোর্স,ডিজাষ্টার রেসপন্স ট্রেনিং কোর্স ইত্যাদিতে অত্র গ্রুপের রোভাররা অংশগ্রহন করে থাকে।বিভিন্ন জাতীয় দিবস যেমন শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মহান স্বাধিনতা দিবস,জাতীয় শোক দিবস, মহান বিজয় দিবস,বিপি দিবস ইত্যাদিতে অংশগ্রহন ও স্বেচ্ছাসেবকের দায়ীত্ব পালন করে।রোভাররা বিভিন্ন ক্ষুদ্র প্রকল্প যেমন বৃক্ষ রোপন,পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করে থাকে।জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে গ্রুপের রয়েছে সাফল্যজনক অংশগ্রহণ।

৬-১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ রোভার স্কাউট প্রশিক্ষন কেন্দ্র বাহাদুরপুর গাজীপরে অনুষ্ঠিত নব জাতীয় রোভার মুটে , ২৬-৩১ ডিসেম্বর ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তাদশ রোভার মুটে, চট্রগামে অনুষ্ঠিত ১১তম এডভেঞ্চার ক্যাম্প, ২৯ জানুয়ারী-৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় রোভার মুট ও ৫ম জাতীয় কমডেকা,২৬-৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ আঞ্চলিক রোভার মুটে, ১০-১৫ জুলাই ২০১৮ অনুষ্ঠিত হজ্ব ক্যাম্প। ২৩-২৯ জানুয়ারী ২০১৯ স্কাউট প্রশিক্ষন কেন্দ্র মৌচাকে অনুষ্ঠিত ১০ম জাতীয় জাম্বুরী, ১৭-২২ ফেব্রুয়ারী ২০২০ অনুষ্ঠিত কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প,১৪-১৯ জুন ২০২২ অনুষ্ঠিত হজ্ব ক্যাম্প,রোভারিং এর শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাইসাইকেল র‍্যালি। বাংলাদেশ স্কাউটস, হবিগঞ্জ জেলা রোভারের আয়োজনে ১ম, ২য় ও ৩য় জেলা রোভার মুটসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত রোভার মুটে গ্রুপের রোভার স্কাউটরা সাফল্যের সহিত অংশগ্রহণ করেছে।

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে বিভিন্ন সময়ে গ্রুপ সভাপতি/অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব মাহবুবুর রহমান, প্রকৌশলী প্রদীপ্ত খীসা, জনাব মোহসিনুর রহমান, প্রকৌশলী মোতাহার হোসেন। বর্তমান গ্রুপ সভাপতি/অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বে আছেন প্রকৌশলী মোঃ আলাউদ্দিন। বিভিন্ন সময়ে রোভার স্কাউট লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক (প্রতিষ্ঠাকা-লীন রোভার স্কাউট লিডার ও সম্পাদক), জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন। সহকারি রোভার স্কাউট লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব শাহজাহান ও জনাব হারিকুর রহমান। বর্তমান গ্রুপ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে আছেন জনাব ফখরুল ইসলাম চৌধুরী, উডব্যাজার।

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের গ্রুপ সভাপতি ও রোভার স্কাউট লিডারবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ স্কাউটস, হবিগঞ্জ জেলা রোভারের নির্বাহী কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেছেন। তদীন্তন অধ্যক্ষ প্রকৌশলী প্রদীপ্ত খীসা, জনাব মোঃ মোহসীনুর রহমান বাংলাদেশ স্কাউটস, হবিগঞ্জ জেলা রোভারের সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বর্তমান অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মোঃ আলাউদ্দিন সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া অত্র প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন রোভার স্কাউট লিডার জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক জেলা রোভারের জেলা রোভার স্কাউট লিডার ও সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান গ্রুপ সম্পাদক জনাব ফখরুল ইসলাম চৌধুরী জেলা রোভার স্কাউট লিডার হিসেবে ২০১৬ সাল থেকে অধ্যাবধি দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপএর রোভারগন যারা বিভিন্ন সময়ে সিনিয়র রোভারমেটের দায়িত্ব পালন করেছেন।রোভার কুতুব উদ্দিন,রোভার এসএম বাসিত, রোভার মোঃ নাজমুল হাসান অপু,রোভার মোঃ আমিনুল ইসলাম সুমন, রোভার প্রনব কুমার দে নয়ন, রোভার মনোয়ার হোসেন, রোভার মাহবুবুর রহমান তানভীর, রোভার মো:কামরুল হাসান,রোভার মো:ওয়া-সম,রোভার মো: কবির হোসেন, রোভার মো: জসিম উদ্দিন, গার্ল ইন রোভার ইফাত জাহান,গার্ল ইন রোভার সুমাইয়া জেবিন।

স্কাউট আন্দোলনে অনবদ্য অবদান ও কাজের স্বীকৃতি বিভিন্ন সময় অত্র প্রতিষ্ঠানের রোভার স্কাউট লিডার বৃন্দ অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন। তদানীন্তন রোভার স্কাউট লিডার জনাব মোহাম্মদ শামছুল হক ২০০৭ এবং ২০১২ সালে সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠ রোভার স্কাউট লিডার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। বর্তমান গ্রুপ সম্পাদক জনাব ফখরুল ইসলাম চৌধুরী-,উডব্যাজার ২০১৮-২০১৯ এবং ২০২০-২০২১ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল থেকে সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠ রোভার স্কাউট লিডার, জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে ২০১৭ ন্যাশনাল সার্টিফিকেট এবং ২০২০ সালে মেডেল অব মেরিট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২২ এ হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ রোভার স্কাউট গ্রুপ হিসেবে অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। গ্রুপ সম্পাদক জনাব ফখরুল ইসলাম চৌধুরী ,উডব্যাজার জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২২ এ উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ রোভার স্কাউট লিডার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। এছাড়া গ্রুপের রোভার স্কাউট মোঃ জসিম উদ্দিন উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ রোভার স্কাউট নির্বাচিত হয়।

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের বর্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মোঃ আলাউদ্দিন ও নিবেদিত রোভার স্কাউট লিডারবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় গ্রুপে রোভার স্কাউটরা অত্যন্ত সুনামের সহিত রোভারিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। রোভার স্কাউটিং কার্যক্রমে এ গ্রুপের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক এটি আমাদের সকলের একান্ত প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান
স্বেচ্ছাসেবক, হবিগঞ্জ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের রেড ক্রিসেন্টের উদ্যোগে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ সহায়তা প্রদান

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে যখন প্রতিদিন অসংখ্য সামরিক ও বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে; সামরিক-বেসামরিক মানুষ মারণাস্ত্রের আঘাতে হতাহত হচ্ছে- এই প্রেক্ষাপটে রেড ক্রস প্রতিষ্ঠার পটভূমি আমাদের সামনে প্রাসঙ্গিক। ১৮৫৯ সালে ইতালির সলফেরিনো পল্লিতে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার। মধ্যে যুদ্ধ শুরুর মাত্র ১৫-১৬ ঘণ্টায় তিন লাখ সৈনিকের মধ্যে আহতের সংখ্যা দাঁড ায় ৪০ থেকে ৪২ হাজার। একদিকে বিজয়ী সৈনিকদের বিজয় উৎসব, অন্যদিকে আহত সৈনিকদের আর্তনাদ। ওই আর্তনাদ জিন হেনরি ডুনান্টের হৃদয়ে দাগ কাটে। তিনি সব ব্যবসায়িক কর্মসূচি স্থগিত করে যুদ্ধাহতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। হেনরি ডুনান্ট তার চার সহকর্মীকে নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমর্থন ও সহায়তার আশায় ১৮৬৩ সালের ২৬। অক্টোবর আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। ওই সম্মেলনে ১৬টি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং হেনরি ডুনান্টের প্রস্তাব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মানবসেবামূলক রেড ক্রস গঠিত হয়। হেনরি ডুনান্ট ১৮২৮ সালের ৮ মে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে মৃত্যুর পর থেকে তার জন্মদিনকে সম্মান দেখিয়ে ৮ মে বিশ্বব্যাপী রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। যুদ্ধাহতদের সেবার লক্ষ্যে। প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠানটি জন্মলাভ করলেও বর্তমানে এর সেবার পরিধি নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত।

শুধু মানবিক বিপর্যয় নয়; পৃথিবীর যেখানে মানুষের দুর্দশা ও অসহায়ত্ব, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ-দুর্বিপাক; রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সেখানেই মানবিক সাহায্য নিয়ে দ্রুত পৌঁছে যায়। ১৮৮টি দেশে জাতীয় রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসে-াইটি সেবা কার্যক্রম পরিচালনা। করছে। বিশ্বব্যাপী প্রায় ৯৭ মিলিয়ন কর্মী এই সেবা কার্যক্রমের সঙ্গে জড ি ত।। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে জাতীয় রেড ক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। সাতটি মূলনীতি নিয়ে রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট কাজ করে। মূলনীতিগুলো হলোমানবতা, নিরপেক্ষতা, পক্ষপাতহীনতা, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছামূলক সেবা, একতা ও সর্বজনীনতা। ১৯৮৮ সালের ৪ এপ্রিল বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির নাম পরিবর্তন হয়ে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি হয়। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জাতীয় সদর দপ্তর, ৬৮টি ইউনিট প্রজেক্ট, ব্লাড ব্যাংক, সোসাইটি পরিচালিত হাসপাতাল, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রের মাধ্যমে মানুষের সেবায় নিয়োজিত। রেড ক্রিসেন্ট শুধু যুদ্ধকালীন নয়, শান্তিকালীনও কাজ করে থাকে। সেবার মনোভাব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত রেড ক্রিসেন্ট যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে খাদ্যসামগ্রী, ওষুধপত্র, বস্ত্র, আশ্রয় সামগ্রী প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী বা যুবকদের। প্রতিনিধির মাধ্যমে সোসাইটির যুব রেড ক্রিসেন্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি স্কুল শিক্ষার্থীদের নিয়ে জুনিয়র রেড ক্রিসেন্ট কার্যক্রম শুরু করে। পরে ১৯৭৮ সালে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য যুব রেড ক্রিসেন্ট কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৩ সালে নামের জটিলতা পরিহার করার উদ্দেশ্যে এবং আন্তর্জাতিকভাবে নামের সামঞ্জস্য রাখার লক্ষ্যে জুনিয়র ও যুব রেড ক্রিসেন্টকে একত্রিত করে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের সব সদস্যের সমন্বয়ে যুব সংগঠনের নাম রাখা হয় 'যুব রেড ক্রিসেন্ট'। ১৯৭৫ সালে বেলগ্রেডে রেড ক্রস সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুব রেড ক্রস বা যুব রেড ক্রিসেন্টের চারটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। তা হলো, জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা করা, সেবা এবং সংহতি, আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব, সমঝোতা ও শান্তির অন্বেষণে শিক্ষা। যুব রেড ক্রিসেন্টের মূলমন্ত্র হলো সেবা-ব্রতী। কাজের মাধ্যমে শিক্ষাই যুব রেড ক্রিসেন্টের মূল লক্ষ্য। মানবসেবায় মহৎপ্রাণ মহাত্মা জিন হেনরি ডুনান্ট শান্তিতে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আজ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ বিপন্ন মানবতার সেবায় নিয়োজিত। এ ছাড ।হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট রেড ক্রিসেন্টের সোসাইটি উদ্যোগে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ সহায়ত প্রদান করে আসছে। স্বেচ্ছাসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসহায় ও দুস্থদের সেবায় যত্নবান হতে। রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনকে আরও গতিশীল করতে সবার সহযোগিতার হাত বাড াতে হবে। মানবতার কল্যাণে ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে সবার পদযাত্রা হোক শান্তির পতাকাতে-ল।।

বিডি ক্লিন হবিগঞ্জ এর পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক ইভেন্ট

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে বিডি ক্লিন

তৌকির বিন কাশেম
উপ সমন্বয়ক আইটি এন্ড মিডিয়া

একা নয়, এক হয়ে একসাথে গড়ে তুলবো পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ, আসুন নিজে সচেতন হই এবং নিজের মাধ্যমে অন্যকে সচেতন করি।

পরিচ্ছন্নতার বার্তা পৌঁছে দেই বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে। আমরাই পারবো বাংলাদেশকে পরিচ্ছন্ন সোনার বাংলাদেশ হিসেবে তৈরী করতে। যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ছুরে ফেলার মানসিকতা বা অভ্যাস পরিবর্তিত করে আপনি যখন ডাস্টবিন ব্যবহার করবেন সেখানেই সকলের সার্থকতা। আমরা যেরকমভাবে নিজেকে গড়ব, আমাদের আগামী প্রজন্মও ঠিক সেভাবেই শিখবে।

আজ আমরা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেখানে সেখানে ময়লা ফেলি তারাও ঠিক আগামীতে তাই করবে। সচেতনতা আসুক পরিবার থেকে। আজ আপনি সচেতন, এবার অন্যকে সচেতন করার পালা। আসুন–

সবাই একসাথে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ি,
ডাস্টবিনের যথাযথ ব্যবহার করি।

আজ থেকে ঠিক ৬ বছর আগে ২০১৬ সালের ৩ জুন তারিখের প্রথম প্রহরে, রাতের ১২ টায় শাহবাগ মোড় থেকে সার্ক ফোয়ারা পর্যন্ত রাস্তা পরিষ্কারের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার কাজ।

প্রত্যাশা ছিল বাংলাদেশের সকল নাগরিক মিলে মিশে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে গড়ে তুলবো একটি পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত বাংলাদেশ। তারই ধারাবাহিকতায় আজ ৬ বছর শেষে ৫৮টি জেলা টিম ও শতাধিক উপজেলা টিমের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে কাজ করে চলেছে ৩৬,৪০০ প্লাস সদস্য।

আমাদের প্রাপ্তি গুলো ক্রমশ দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে, আমরা আজ পুরো বাংলাদেশে জুড়ে পেয়েছি হাজারো তারুণ্য, যারা প্রাণপ্রিয় এ দেশকে পরিচ্ছন্ন করতে পরিচ্ছন্নতার এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

এ সকল সদস্যগণ পরিচ্ছন্ন দেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করার পাশাপাশি, নিজ নিজ মানসিকতার মানোন্নয়নে অবিরাম চর্চারত। অব্যাহত এ চর্চার মাধ্যমে বিডি ক্লিন এর সকল সদস্য ক্রমশই নিজেকে গড়ে তুলছেন আদর্শবান সুনাগরিক হিসেবে।

আদর্শবান সুনাগরিক হবার চর্চায় বিডি ক্লিন এর সদস্যগণ প্রতিনিয়ত পরিহার করে চলেছেন নিজের মাঝে থাকা সকল খারাপ অভ্যাস।

সে দিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন সারা দেশের সকল নাগরিকগণ নিজের মাঝে থাকা খারাপ অভ্যাসগুলো পরিহার করে মানসিকতার মানোন্নয়নের চর্চায় মেতে উঠবেন।

খুব শিঘ্রই আসবে সেই দিন, যেদিন বাংলাদেশ হবে সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পরিচ্ছন্ন দেশ, আর নাগরিকগণ হবে বিশ্বসেরা আদর্শবান সুনাগরিক। সেদিনই হয়তো সারা বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কেরা একসাথে আন্তর্জাতিক সম্মেলন করে আকুতি জানিয়ে বলবে "আমাকে বাংলাদেশের মত একজন আদর্শবান সুনাগরিক দাও, আমি তোমাদেরকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র উপহার দিব"।

এমনি এক উদ্দেশ্য নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে তারুণ্য নির্ভর স্বপ্ন পূরণের প্লাটফর্ম বিডি ক্লিন। তারুণ্যরা কখনো পিছু হটেনি, তারুণ্যরা কখনো পরাজয়ও বরন করেনি বরং অসীম সাহস নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। বিডি ক্লিন তারুণ্যরাও এর ব্যতিক্রম নয়। সবার সহযোগিতা থেকে প্রাপ্ত অনুপ্রেরণা নিয়ে নির্ভীক এই বিডি ক্লিন তারুণ্যরাই একদিন পৃথিবী মানচিত্রে এঁকে দিবেন পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত বাংলাদেশের নাম।

বিডি ক্লিন শুধু একটি নাম নয়, নয় শুধু একটি প্ল্যাটফর্ম। বিডি ক্লিন একটি শৃঙ্খলার শিক্ষাকেন্দ্র, যেখানে খারাপ অভ্যাস পরিহারের মাধ্যমে মানসিকতার মানোন্নয়নের চর্চা করা হয়।

"রক্তে অর্জিত বাংলার মাটি,
মানবতার সেবায় আমরা করবো খাঁটি"

শিমু আক্তার
(উপ-তথ্য বিষয়ক সম্পাদিকা)

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের একটি মাত্র অরাজনৈতিক, সামাজিক ও সেবা মূলক সংগঠন ""মানবতার সেবায় আমরা""। এই সেবা মূলক সংগঠটির যাত্রা শুরু হয় ২০১৪ সালের ১৩ মে (বিশ্ব মা দিবসে)।

তখন থেকে """মানবতার সেবায় আমরা"" সংগঠটির কাজ হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলছে।

শুরুতেই,

শীতবস্ত্র বিতরণ।

রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা ও রক্তদান।

এই দুটি কর্মসূচি হাতে নিয়ে পথ চলতে থাকে।কিন্তু পরর্বতীতে শুধু এই দুটি কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং আরও যুক্ত করা হয়।

বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ।

গরীব শিক্ষার্থীদের বইয়ের ব্যাবস্থা।

অসহায় ও অসুস্থ গরীব ছাত্রদের চিকিৎসার ব্যবস্থা।

গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা।

নবীন শিক্ষার্থীদে শুভেচ্ছান্তে নবীন-বরণ করা,

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম।

এসবের মধ্যে রক্তদান ছিলো নিয়মিত সেবা। এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১৫০০+ ব্যাগের রক্তের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

"মানবতার সেবায় আমরা সংগঠনে" জড়িত প্রতিটি মানুষের মাঝে এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে যে শক্তি কাজ করে সেটা হচ্ছে মানুষের মানবতাবোধ।যার মাঝে মানবতারবোধ রয়েছে সেই মানবসেবার কাজে এগিয়ে আসে। যার মাঝে মানবতাবোধ রয়েছে সে অবশ্যই অসহায়, দুঃসহ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগীতায় এগিয়ে আসে ।অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। রাসূল (সাঃ) বলেন, "তোমরা জগৎবাসীর প্রতি সদয় হও, তাহলে আসমানের মালিক আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের প্রতি সদয় হবেন"।

আমাদের সংগঠনটি হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সকল শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও তাদের সহযোগিতার মাধ্যমেই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উক্ত কলেজের সকল শিক্ষকগণ আন্তরিকতার সহিত আমাদের সর্বদা,সব বিষয়ে সহযোগিতা ও সৎ উপদেশ প্রদান করে থাকেন।তাই এখনও ""মানবতার সেবায় আমরা"" সংগঠনটি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মত মহৎ কাজটি নিয়মিত ভাবে করে চলছে।

এভাবেই "জয় হোক মানবতার, জয় হোক মানবের"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, হবিগঞ্জ।
ফোন: ০৮৩১-৬২৩২০ ফ্যাক্স: ০৮৩১-৬২৫৫৩
E-mail-principal.hpi@gmail.com
Website: www.hpi.gov.bd

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

আপডেট তারিখ- ২৮/০২/২০২২ খ্রিঃ

১. ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ যুগোপযোগী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, শিল্পের বিকাশ এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

মিশনঃ মান সম্পন্ন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং, বেসিক ট্রেড কোর্সে, এবং এনটিভিকিউএফ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

২. সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি

২.১ নাগরিক সেবা

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাম,পদবী,ফোন, ইমেইল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	তথ্য অধিকার আইনে তথ্য সরবরাহ	চাহিত তথ্যাদি সরবরাহকরণ	চাহিত তথ্যের নমুনা মোতাবেক আবেদনপত্র	বিনামূল্যে	তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়	মোহাম্মদ নরুল্লাহ্‌ ডিপার্টমেন্ট প্রধান(নন-টেক) মোবাইল: 01712-365679
২	সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে সরাসরি তথ্য প্রদান	সরাসরি নাগরিকদের নিকট থেকে চাহিত সেবার তথ্য সংগ্রহ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ	মৌখিক নির্দেশনা	বিনামূল্যে	তাৎক্ষনিক	(ক) মোঃ মোখলেছ আহমেদ রেজিস্ট্রার মোবাইল: 01714-898357 (খ) সুনতোষ চাকমা সহকারী রেজিস্ট্রার ০১৭৬৭-৮৩০৬০৬

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাম,পদবী,ফোন, ইমেইল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	সিলেকশন গ্রেড/উচ্চতর স্কেল/বেতন নির্ধারণ/বেতন সমতা	অনুবিভাগের,মেইল, ওয়েবসাইট ও ডাকযোগে প্রেরণ	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ছকে আবেদন ও প্রাপ্তিস্থান : সংশ্লিষ্ট শাখা	বিনামূল্যে	৭ দিন	(ক) মলয় চৌধুরী, হিসাব রক্ষক মোবাইল: ০১৭১১-৮৩৩৮৭০ (খ) মোহাম্মদ আব্দুল খালেক প্রধান সহকারী মোবাইল: ০১৭১৫-২৪০১৬১
২	বৃত্তি/উপবৃত্তি/রেজিস্ট্রেশন/ফরম ফিলাপ/ভর্তি আবেদন	সরাসরি,মেইল, ওয়েবসাইট ও ডাকযোগে প্রেরণ	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ছকে আবেদন ও প্রাপ্তিস্থান : সংশ্লিষ্ট শাখা	বিনামূল্যে	৭ দিন	(ক) মোঃ মোখলেছ আহমেদ রেজিস্ট্রার মোবাইল: 01714-898357 (খ) সুনতোষ চাকমা সহকারী রেজিস্ট্রার ০১৭৬৭-৮৩০৬০৬

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাম,পদবী,ফোন, ইমেইল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩	পরীক্ষার টেবুলেশন প্রস্তুত,ফলাফল প্রকাশ, ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদান	সভাসার,মেইল,ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রেরণ	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ছকে আবেদন ও প্রাপ্তিস্থান : সংশ্লিষ্ট বিভাগ	বিনামূল্যে	১০ দিন	(ক) সকল বিভাগীয় প্রধান (খ) মোঃ তোফায়েল আহমেদ রেজিস্ট্রার মোবাইল: 01714-898357 (খ) জুবনেল চাকমা সহকারী রেজিস্ট্রার ০১৭৬৭-৮৩০৬০৬ (ঘ) আইটি স্পেশালিস্ট
৪	মামলা সংক্রান্ত মতামত অধিদপ্তরে প্রেরণ	পত্রের মাধ্যমে	মামলার আর্জি, রায়ের কপি, আনুসঙ্গিক অন্যান্য ডকুমেন্ট	বিনামূল্যে	৭ দিন	মোহাম্মদ আবুল খায়ের প্রধান সহকারী মোবাইল: ০১৭১৫-২৪০১৬১
৫	বার্ষিক বাজেট প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন	বিভিন্ন বিভাগ থেকে চাহিদা সংগ্রহ করে আলোচনার মাধ্যমে	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ছকে আবেদন ও প্রাপ্তিস্থান : সংশ্লিষ্ট বিভাগ	বিনামূল্যে	১০ দিন	(ক) মলয় চৌধুরী, হিসাব রক্ষক মোবাইল: ০১৭১৯-৮০০৮৭০ (খ) মোহাম্মদ আবুল খায়ের প্রধান সহকারী মোবাইল: ০১৭১৫-২৪০১৬১
৬	অডিট আপত্তির বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা	বডশীট অনুযায়ী জবাব তৈরী, অগ্রায়ণ ও প্রতিবেদন ই-মেইলে প্রেরণ	বডশীট	বিনামূল্যে	১০ দিন	(ক) মলয় চৌধুরী, হিসাব রক্ষক মোবাইল: ০১৭১৯-৮০০৮৭০ (খ) মোহাম্মদ আবুল খায়ের প্রধান সহকারী মোবাইল: ০১৭১৫-২৪০১৬১
৭	অভিভাবক সমাবেশ, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন	অফিস নির্দেশ/ই-মেইল	সাধারণ শাখা	বিনামূল্যে	৭ দিন	(ক) মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ বিভাগীয় প্রধান(নন-টেক) মোবাইল: 01712-365679 (খ) ফখরুল ইসলাম চৌধুরী বিভাগীয় প্রধান , ইলেকট্রনিক্স মোবাইল: 01558347266
৮	বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন	অফিস নির্দেশ/ ওয়েবসাইট/ই-মেইল	মন্ত্রনালয় হতে প্রাপ্ত নোটিশ/ অফিস আদেশ	বিনামূল্যে	৪ দিন	(ক) মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ বিভাগীয় প্রধান(নন-টেক) মোবাইল: 01712-365679 (খ) মাহমুদুল হাসান ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক) মোবাইল: ০১৯২৫৭৩৩০৩৫
৯	শিক্ষক কর্মচারীদের ছুটি মঞ্জুর (শিক্ষা ছুটি/ বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি, প্রাপ্য বিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি, মাতৃত্ব ছুটি ইত্যাদি)	আবেদন, ছুটি পাওনা প্রত্যয়ন সাপেক্ষে অফিস আদেশ	আবেদনপত্র, ছুটি পাওনার প্রত্যয়নপত্র	বিনামূল্যে	৭ কর্মদিবস	(ক) মলয় চৌধুরী, হিসাব রক্ষক মোবাইল: ০১৭১৯-৮০০৮৭০ (খ) মোহাম্মদ আবুল খায়ের প্রধান সহকারী মোবাইল: ০১৭১৫-২৪০১৬১

ক্রমিক নং	সেবার মান	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাম,পদবী,ফোন, ইমেইল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০	শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত	আবেদন ও হিসাব শাখার সম্মতি সাপেক্ষে অফিস আদেশ	আবেদনপত্র, হিসাব শাখার সম্মতিপত্র	বিনামূল্যে	১০ কর্মদিবস	(ক) মলয় চৌধুরী, হিসাব রক্ষক মোবাইল: ০১৭১৯-৮০০৮৭০ (খ) মোহাম্মদ আবুল খায়ের প্রধান সহকারী মোবাইল: ০১৭১৫-২৪০১৬১
১১	প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়	PPR ২০০৮ অনুসরণে কার্যাদেশ প্রদান	TEC কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সিডিউল	বিনামূল্যে	দরপত্র প্রকাশের ৯০-১২০ দিনের মধ্যে	অনুমোদিত ক্রয় কমিটি
১২	পুরাতন/অকেজো মালামাল বিক্রয়	PPR ২০০৮ অনুসরণে কার্যাদেশ প্রদান	TEC কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সিডিউল	বিনামূল্যে	দরপত্র প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে	অনুমোদিত ক্রয় কমিটি

৩.অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি সমাধানে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্রমিক নং	কখন যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধানে ব্যর্থ হলে	ফখরুল ইসলাম চৌধুরী বিভাগীয় প্রধান , ইলেকট্রনিক্স ও ফোকাল পয়েন্ট মোবাইল: 01558347266	অভিযোগ দাখিলের ১৫ দিনের মধ্যে
২	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধানে ব্যর্থ হলে	মোঃ আলাউদ্দিন অধ্যক্ষ মোবাইল: ০১৭১২০২৯৩৮১ ইমেইল: alauddin90106@gmail.com	অভিযোগের ধরণ অনুযায়ী দ্রুততম সময়ের মধ্যে

৪.আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা

ক্রমিক নং	প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১	নির্ধারিত সময়, সঠিক সময় পূরণকৃত আবেদন ফরম জমা দেয়া
২	সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই উপস্থিত হওয়া
৩	প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করা

-সমাপ্ত-

বিভিন্ন টেকনোলজি/বিভাগ পরিচিতি

সিভিল (পুরকৌশল) ইঞ্জিনিয়ারিং

পুরকৌশল পেশার ইতিহাস ঃ মানব সভ্যতার শুরু থেকে প্রকৌশল জীবন ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৮১৮ সালে লন্ডনে ইন্সিটিউট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার প্রতিষ্ঠিত হয় । যুক্তরাষ্ট্রে নরউইচ ইউনিভার্সিটিতে প্রথম বেসরকারি কলেজ হিসেবে পুরকৌশল পড়ান শুরু করা হয়, ১৮১৯ সালে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৩৫ সালে রেন্সিলেয়ার পলিটেকনিক ইন্সিটিউট থেকে পুরকৌশলে সর্বপ্রথম ডিগ্রি প্রদান করা শুরু হয়। ১৯০৫ সালে প্রথম নারী হিসেবে পুরকৌশলে সেই ডিগ্রী পান নোরা স্ট্যান্টোন ব্লাচ কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ কি ? সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যুক্তিযুক্তভাবে প্রাচীনতম প্রকৌশল শাখা। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আধুনিক সমাজের মৌলিক চাহিদা এবং সুবিধা (বা অবকাঠামো) উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে। তারা সমাজের সিস্টেম এবং প্রক্রিয়াগুলিকে উন্নত করে। আধুনিক সমাজ তাদের ছাড়া চলতে পারে না। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজাইন ও নির্মাণের জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দরকার। জল সরবরাহ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়াদের প্রয়োজন। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কাঠামোগত কাজের নকশা এবং বাস্তবায়নের পেশা যা সাধারণ জনগণের সেবা করে, যেমন বাঁধ, সেতু, জলপথ, খাল, মহাসড়ক, বিদ্যুৎকেন্দ্র, নকশা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অবকাঠামো নিয়ে কাজ করে সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা রাস্তা, ভবন, বিমানবন্দর, টানেল, বাঁধ, সেতু, নর্দমা এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা সহ সরকারি ও বেসরকারি খাতে অবকাঠামো প্রকল্প এবং সিস্টেমগুলি ধারণা, নকশা, নির্মাণ, তত্ত্বাবধান, পরিচালনা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে। অনেক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পরিকল্পনা, নকশা, নির্মাণ, গবেষণা এবং শিক্ষায় কাজ করে।

সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা সাধারণত নিম্নলিখিত কাজগুলি করেন:-

১. প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং নকশা করার জন্য দীর্ঘ পরিসরের পরিকল্পনা, জরিপ প্রতিবেদন, মানচিত্র এবং অন্যান্য ডেটা বিশ্লেষণ করুন।

২. একটি প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং ঝুঁকি-বিশ্লেষণ পর্যায়ে নির্মাণ ব্যয়, সরকারী বিধি, সম্ভাব্য পরিবেশগত বিপদ এবং অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করুন।

৩. স্থানীয়, প্রশাসন এবং ফেডারেল এজেন্সিগুলিতে পারমিট আবেদনগুলি সংকলন করেন এবং জমা দেয়, যাচাই করে যে প্রকল্পগুলি বিভিন্ন প্রবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখে।

৪. ভিত্তিগুলির পর্যাপ্ততা এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য মাটি পরীক্ষার ফলাফলগুলি পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করুন।

৫. বিশেষ প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য কংক্রিট, কাঠ বা ইস্পাতের মতো নির্মাণ সামগ্রীর পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করুন।

৬. একটি প্রকল্পের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা নির্ধারণের জন্য উপকরণ, সরঞ্জাম, বা শ্রমের জন্য খরচের অনুমান প্রস্তুত করুন।

৭. পরিবহন ব্যবস্থা, হাইড্রোলিক সিস্টেম এবং কাঠামোর পরিকল্পনা এবং নকশা করার জন্য শিল্প সফটওয়্যার ব্যবহার করে শিল্প এবং সরকারের মান অনুযায়ী।

৮. বিল্ডিং লোকেশন, সাইট লেআউট, রেফারেন্স পয়েন্ট, গ্রেড, এবং গাইড নির্মাণের জন্য উচ্চতা স্থাপনের জন্য জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা বা তদারকি করুন।

৯. সরকারি ও বেসরকারি অবকাঠামোর মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিস্থাপন পরিচালনা করুন।

আর্কিটেকচার টেকনোলজি

আর্কিটেকচার এর বাংলা প্রতিশব্দ স্থাপত্যবিদ্যা। সাধারণত স্থাপত্য বলতে আমরা নির্মাণকৌশলকেই বুঝি। আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে স্থাপনা শিল্পেও এসেছে নতুনত্ব। আর্কিটেকচারে এই উন্নয়নকে কাজে লাগিয়ে তৈরী করা হচ্ছে আরামদায়ক গ্রহণযোগ্য শিল্প মন্ডিত ও রুচি সম্মত সুন্দর স্থাপনা। স্থাপত্যবিদ্যা মূলত ডিজাইন ও কৌশলকে প্রাধান্য দেওয়ায় এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর উদ্ভাবনী শক্তি আর এই ডিজাইন ও সৌন্দর্যকে পুজি করে দেশে শহর বন্দর গ্রামকে আর ও সুন্দর করে উপস্থাপন করাই স্থাপত্যবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বের দরবারে স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য যেখানে একত্রে মিলিত হয় সেখানে একটি টেকশই সৌন্দর্য বিকাশ ঘটে। বিশ্বের দরবারে যে সকল স্থাপত্য মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে, যেমন IFET Tower , তাজমহল, রোমের স্থাপত্য, চীনের প্রাচীর, ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান- এ গুলো শুধু দীর্ঘস্থায়ী তাই নয় বরং তাদের সৌন্দর্য ও ডিজাইন সারা বিশ্বকে মুগ্ধ করেছে। এছাড়া প্রতিনিয়ত আর্কিটেকচার সমগ্র পৃথিবীতে প্রসার লাভ করছে। কেবল মাত্র আর্কিটেকচার টেকনোলজিতে পড়লেই নিজের কর্ম সংস্থান নিজেই তৈরি করা সম্ভব।

Architecture Engineering এর কর্মক্ষেত্র সমূহ ঃ

নগর ভবনে শহরের সৌন্দর্য বর্ধনে Architect দের প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

বিভিন্ন Architecture এবং Construction Firms এ Architect হিসাবে প্রচুর চাকরির সুযোগ রয়েছে।

শহরকে পরিকল্পনা মাফিক সাজাতে Town Planning Agencies -তে প্রচুর কর্মক্ষেত্র আছে।
নিজস্ব Consultation Firm গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এদের প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে।
বর্তমানে দেশে বিভিন্ন Housing Company, Real Estate Company- তে সহকারী Architect হিসাবে প্রচুর কর্মক্ষেত্র রয়েছে।
এছাড়া সরকারী বিভিন্ন সেক্টর ও প্রচুর সহকারী Architect নেওয়া হয়।
সহকারী এবং বেসরকারী পলিটেকনিক গুলোতে জুনিয়র আর্কিটেক্ট হিসাবে চাকুরী পেতে পারে।

কম্পিউটার টেকনোলজি

কম্পিউটার টেকনোলজি বা প্রকৌশল হলো প্রকৌশল বিদ্যার একটি শাখা যেখানে কম্পিউটারের সাহায্যে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কম্পিউটার সফটওয়্যার, ই-মেইল, টেলিফোন, ভয়েসমেইল, ফ্যাকসিমিল মেশিন, অনলাইন পরিসেবা, ইন্টারনেট এবং সমস্ত ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং পরিসেবা গুলিকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হয়। বর্তমান ডিজিটাল যুগের প্রধান চালিকা শক্তি হলো কম্পিউটার প্রযুক্তি। কম্পিউটার প্রযুক্তি মানুষের জীবন যাত্রাকে করেছে গতিময় ও উন্নত। বিভিন্ন সফটওয়্যার ফার্ম, ওয়েবসাইট তৈরী ও ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট , আইএসপি (ওঝচ) কোম্পানি, গ্রাফিক্স ডিজাইনারসহ বর্তমান সরকারের ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বা রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দক্ষ মানবসম্পদের চাহিদা মোকাবেলায় কম্পিউটার ডিপ্লোমা প্রকৌশলীর চাহিদা ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে। এই প্রযুক্তিতে অধ্যয়ন করে ছাত্র/ছাত্রীরা যে দক্ষতা অর্জন করে, তা দিয়ে খুব সহজেই ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সম্ভব, যা বেকার সমস্যা সমাধান ও দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রাখছে। হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কম্পিউটার টেকনোলজির শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন নামকরা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে অত্যন্ত সুনামের সাথে চাকরি করছে। পাশাপাশি দেশে ও বিদেশে আমাদের শিক্ষার্থীরা সফলতার সাথে উচ্চশিক্ষা গ্রহন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রাখছে।

ইলেকট্রনিক্স প্রকৌশল

প্রকৌশলবিদ্যার একটি শাখা যেটি ইলেক্ট্রনের প্রভাব ও আচরণ সম্পর্কিত। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে বিভিন্ন উপাদান, যন্ত্রপাতি, (যেমন ইলেক্ট্রন টিউব, ট্রানজিস্টর, সমন্বিত বর্তনী) ইত্যাদির নির্মাণ, পরিমার্জন, পরিবর্ধন করে। ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি বা উপাদানের চালিকাশক্তি হিসেবে তড়িৎ শক্তি ব্যবহৃত হয়। এই প্রকৌশলের অন্তর্গত শাখার মধ্যে তড়িৎশক্তি, টেলিযোগাযোগ প্রকৌশল, অর্ধপরিবাহী দ্বারা নির্মিত তড়িৎ বর্তনী অন্যতম।

আধুনিক সভ্যতার চালিকা শক্তি হল ইলেকট্রনিক্স টেকনলোজি। সমাজের সব ধরনের লোকজন এই টেকেনলোজির সুযোগে সুবিধা পেয়ে আসছে। ইলেকট্রনিক্স মানুষের জীবনযাত্রাকে করছে আধুনিক ও উন্নত। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানায় এই টেকনলোজীতে পাশ করা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া যারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে কম খরচে কোন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চায় তাদের জন্য ইলেকট্রনিক্স টেকনলোজি ভিত্তিক লেখাপড়া অত্যন্ত উপযোগী সমাজে যে হারে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ছে তাতে করে দেশে দক্ষ ইলেকট্রনিক্স ডিপ্লোমা প্রকৌশলীর চাহিদা ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে। এই টেকনলোজীতে অধায়ন করে ছাত্র/ছাত্রীরা যে দক্ষতা অর্জন করে তা, দিয়ে খুব সহজেই ক্ষুদ্র প্রকল্প গ্রহন ও বিপননের মাধ্যমে আত্মকর্ম সংস্থান সম্ভব, যা বেকার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা

রাখছে। হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ইলেকট্রনিক্স টেকনলোজির শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন নামকরা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে অত্যন্ত সুনামের সাথে চাকরি করছে। পাশাপাশি দেশে ও বিদেশে আমাদের শিক্ষার্থীরা সফলতার সাথে উচ্চশিক্ষা গ্রহন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রাখছে।

নন-টেকনিক্যাল বিভাগ(আনুষঙ্গিক বিভাগ)

নন-টেকনিক্যাল বিভাগ(আনুষঙ্গিক বিভাগ) প্রযুক্তি ও প্রকৌশল জগতে অত্যন্ত অপরিহার্য একটি বিভাগ।খাবার হজম করতে যেমন এমাইনো এসিড ও অক্সিজেনের দরকার হয়, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিদ্যা রপ্ত করতেও আনুষঙ্গিক বিভাগের রয়েছে তেমনি গুরুত্ব। একটির সঙ্গে আরেকটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আনুষঙ্গিক বিভাগটি বিজ্ঞান, মানবিক, বানিজ্য ও অন্যান্য সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত একটি বিভাগ। ম্যাথমেটিক্স ও ফিজিক্স ছাড়া প্রযুক্তিবিদ ও প্রকৌশলী হওয়ার কথা কল্পনাই করা যায় না। এ দুটি বিষয়কে বিজ্ঞানের মা-বাবা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।মানুষের মেধা-মনন ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ করতে আনুষঙ্গিক বিভাগের প্রতিটি বিষয়েরই রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিভাগে ভর্তি হওয়ার পূর্বশর্ত হলো ম্যাথমেটিক্স ও ফিজিক্স এ শক্ত ভিত্তি।

বিভিন্ন টেকনোলজি/বিভাগ এর ব্যবহারিক ক্লাস (আংশিক) এর আলোকচিত্র

সিভিল ল্যাব

সিভিল ল্যাব

ইলেকট্রনিক্স ল্যাব

ইলেকট্রনিক্স ল্যাব

আর্কিটেকচার ল্যাব

কম্পিউটার ল্যাব

কেমিস্ট্রি ল্যাব

ফিজিক্স ল্যাব

সিলেট বিভাগে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ'২০২২ এ অর্জন

সহশিক্ষা কার্যক্রমের আলোকচিত্র (আংশিক)

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর প্রধান ফটক

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর মূলভবন

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এ বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এ শহীদ মিনার

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এ বঙ্গবন্ধু কর্ণার

হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এ লাইব্রেরী

Enterprise Challenge Award Organised by British Counsil

স্কিল কম্পিটিশন

বিভিন্ন দিবস উদযাপন ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের আলোকচিত্র

৭ মার্চ

১৭ মার্চ

২৬ মার্চ

ক্লিনিং ডে

কোভিড ভ্যাকসিন

এমপ্লয়ার ফেয়ারওয়েল

ফেয়ারওয়েল

আইডি কার্ড

ইন হাউজ

ল্যাংগুয়েজ ডে

নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন

ভিক্টোরি ডে

বৃক্ষরোপন

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর উপর ওপেন বুক এক্সাম

বিজ্ঞানমেলা

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা